KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 23/3 24/1 24/2 (Special NO.) 24/2 (Special NO.) 24/4 25/3	Year of Publication : March 1959 Sep 1959 Jan 1960 (আষাঢ় ১৩৬৬) (চৈত্র ১৩৬৬)
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক

চৈত্র ১৩৪৮

এক টাকা

কবিতা
চৈত্র ১৩৬৫
বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩
ক্রমিক সংখ্যা ৯৭

পৃথিবীতে

অমিয় চক্রবর্তী

সবই ঘটেছিল সেই যুগ-অনির্বাণ আয়ুকালে
সবই ঘটেছিল
আয়ুকালে, সেইদিন শীতের সকালে
পৃথিবীতে ঘটেছিল, হঠাৎ দরজা খুলে দিল

পাশের পথিক, বলে "বাইরে এসো, এসো দেখো চেয়ে
উৎসব জানো না বুঝি? বাইরে এসে
দেখো চেয়ে বাজনা-বাজা প্রাণে-সাজা রাঙা রাস্তা বেয়ে
চলেছে মিছিল, এসো, রোদে ঝিলমিল দূর দেশে

দু-মুহূর্ত স্রোতে।" সেই দূর দেশে, আলো-স্রোতে নেমে
চোখে চোখ ঠেকে গেল, ব্রিজের পাথর-কাঁপা ধ্বনি
শিঙা ঢাক খঞ্জনির দ্রুত মগ্ন তালে-তালে থেমে
সমুখ বুকের নীলে মিল মুদ্রা, পেয়েছি তখনি

সেই মাত্রা-স্পর্শ তার—বহু ভিড়ে—উৎসব মিছিল
যার জ্যোতি আয়োজনে অগণ্য গ্রহের কক্ষে-চলা ;
শুভ্র শাঁখে বাজে কান্না, হাসির করুণা যার মিল,
রাঙা রাস্তা প্রাণে-সাজা, দু-মুহূর্তে সেই কথা বলা—

সবই ঘটেছিল ; সেই মহা আয়ুকালে
সবই ঘটেছিল
কোনদিন পৃথিবীতে বন্ধ সেই শীতের সকালে
হোটেলের একা ঘরে, হঠাৎ দরজা খুলে দিল ॥

একজন ইঁদুরের কাহিনী

জ্যোতির্ময় দত্ত

কখনো দেখেছি তাকে, শব্দ শুনে,
স্তব্ধ হ'য়ে যেত যেন নকল বাল্মীক,
আবার মিলিয়ে গেল আচম্বিতে ঘাসে।
স্পষ্টত মূষিক ছিল, অথচ এখন
পাতায় কম্পন মাত্র। বায়ু কিংবা ধোঁয়া। কিংবা ঘাসের নিশ্বাস।

কখনো আশ্চর্য লঘু, চলে না তো, ভাসে।
দূর থেকে মনে হয় বুঝি হরবোলা
উড়ে গেলো ঘাসের আকাশে।
আবার নেশায় বুঁদ তন্দ্রালু হাকিম
দুপুরে ঢুলছে ব'সে স্বপ্নের এজলাশে।

কী যেন কী বুনছিল ঘাসের গোড়ায়—
কোথায় উধাও হ'লো সেই ব্যস্ত চাষা ?
বাতাসে কাঁপছে যার, রোম নয়, মসৃণ রেশম
কোনো জংলি নৃপতির সে অলস রানী ?
মায়া। দেখছো না যোগাসনে ধ্যানমগ্ন মুনি।

সেদিন দু'জনে পথে আচমকা হ'লো চোখাচোখি ;
চোখ নয়, মৌমাছি বসেছিলো মুখে
সে-দৃষ্টি হঠাৎ যেন কামড়ালো বুকে ;
আমাকে অবশ ক'রে সম্মোহনে জড়িয়ে শরীর,
পলকে উধাও হ'লো, ডুবে গেলো ঘাসের পুকুরে।

তখন ভেবেছি তাকে বৃদ্ধ জাদুকর।
অতিরিক্ত নেশা ক'রে মন্ত্র ফুঁকে-ফুঁকে,
একদা বর্ষার রাতে চেয়েছিলো হ'য়ে যেতে
গরম পশুর বুকে নরম শাবক,
চেয়েছিলো হ'য়ে যেতে গাভী কিংবা সুঘ্রাণ শূকর।

একলা ধুনির আঁচে, গ্রাম থেকে দূরে,
বর্ষায় নেশার ঘোরে ভেবেছিলো ঝোঁকের মাথায়
কী হবে জাদুর বলে যদি তাতে না জোটে আরাম,
এমনি প্রত্যেক রাতে হৃদয়ে ভাবনা যদি খায় কুরে-কুরে?
এর চেয়ে ভালো হ'তো বকের নরম বুকে গেলে।

খেয়ালের বশে তাই হ'য়ে গেছে নিতান্ত ইঁদুর;
মাটির শরীর ছুঁয়ে সারাদিন আছে।
হে প্রভু, হয়েছো সুখী? দেহে পাও পশুর আরাম?
এমন অস্থির ভবু; ধাক্কা দিয়ে কে যেন ছুটোয়?
এখনো পিছনে তবে আছে সেই চিন্তার কুকুর?

কারাগার দেহ তার, কুঠুরির ঘুলঘুলি চোখ;
কয়েদে পুরেছে তাকে শয়তান রাজা।
ঝিমোতে গেলেই তাকে মারছে চাবুক,
তৃষ্ণায় কাতর হ'লে সেঁকছে আগুনে—
সেদিন থমকে গেছি, দৃষ্টি নয়, আর্তনাদ শুনে।

ছায়া

শান্তিকুমার ঘোষ

(Michel Geoghegan-কে)

শুধু সাঁচ্চা নীল আকাশ বিঁধেছে গম্বুজের চূড়া।
মিনারেট-মিনারের ছন্দ:
ভারি প্রতিধ্বনি ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসে শুভ্র স্তূপে।
সুগন্ধি আস্বচ্ছ
কী সৌন্দর্য লালন করছে অস্তসূর্য রোজ।

জলে তাজমহলের প্রিয় ছায়া দুলিয়ে ভেঙো না তুমি॥

প্রতিভাসের মুক্তি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে নেবো না জেনো স্ফীত লাল এমন বিকেলে
পড়ন্ত বেলায় আমি একা হেঁটে যাবো, দুঃখ একা।
কিংবা পরবাসে গাঢ় প্রতিশ্রুত অগ্নি কাছে পেলে
তোমার উজ্জ্বল তুচ্ছ ; আমি দুঃখে তবু স্বর্ণরেখা।

আমার তেমন ঘুম দেখনিকো, ব্যর্থ গরবিনী,
বৃষ্টির নিলাজ নৃত্যে···নগ্ন রোদে তীক্ষ্ণ হারপুনে,
বিঁধে যাই, পুড়ে যাই, শব্দপুঞ্জে···বীভৎস আগুনে ;
স্মৃতি ওড়ে, ধুলো জল···কিছুই দেখনি, শরীরিণী।

চিরকাল স্বেচ্ছাচারে মমতা রেখেছি। চৈত্র মাস
বিকেল মানুষ বাড়ি···ফুটপাথে চাঁড়াল বাতাস
অনেক রাত্তিরে, জানি, গান গায়। বিষাক্ত শহরে
ভাঁড়, সং, আরশোলা কিংবা কোনো গণিকার বিবর্ণ বিবরে
আস্থা রাখি চিরকাল···তারা প্রাণ, আমি দূর প্রীতি।
বুকে বড়ো প্রীতি লাগে এই সব দুঃখী হাওয়া, স্মৃতি
মাঝে-মাঝে বৃষ্টি দেয়, এলোমেলো ছেঁড়া হাহাকার
কঠিন কংক্রীটে মারে মেঘ-ফাটা আলোর কুঠার।

আমি আজ অবিশ্বাস্···স্বাভাবিক অন্তত এখন
তোমাকে নেবো না এই সিম্ফনির উতল উল্লোলে।
লজ্জিত থাকি না মোটে ; এ তো নয় তেমন যৌবন
এক টুকু ছোঁয়া লেগে গ'লে যায় কটাক্ষের ধূর্ত রলরোলে।

ঈশ্বর প্রলাপ মাত্র···ক্রুশবিদ্ধ বেকুব রাখাল
গ্রটেস্ক ছবির মুখ—ঝরেছে দুনিয়াদারি চালে,
কর্কশ ঈশ্বরী নাচে চতুর বাণিজ্যে চিরকাল ;
কিম্ভূত নক্টার্ন ফেরে রেস্তরাঁয়, ইতর দেয়ালে।

ইদানীং কথা বলি সহজিয়া দখিনা সমীরে,
দোকানে বাজারে ঘুরি—কোথায় ঈশ্বর আমি চিনি।
মগ্ন ঢেউয়ে উঠি নামি কাটা-ছেঁড়া ঝড়-দাগা ভিড়ে ;
শিকড়ে সুস্থির আছি, ভয় নেই।—হাসেন হুডিনি॥

হেরমান হেসসে-র দুটি কবিতা

বসন্ত ছিল

ঝোপে-ঝোপে হাওয়া, এবং পাখির গান,
ঊর্ধ্ব আকাশে ঘন নীল সরোবরে
নীরব মেঘের নৌকাটি ভাসমান···
সোনালি চুলের রূপের স্বপ্ন ভরে ;
যৌবনময় দিবসে, স্বপ্ন আমার,
রূপরেখা পায়, আর নভো নীলিমার
দোলনায় দোল খেয়ে
উৎসুক আমি কোমল, স্নিগ্ধ আর
মৃদুতম উত্তাপে,
স্তোত্র ও গান গেয়ে
শুয়ে থাকি, যেন শিশুসন্তান যাপে
কোমল অঙ্কে মা-র।

ফুল, গাছ, পাখি

উজ্জ্বল হও একাই হৃদয়
সময়ের অনুকূল।
সে-নারী ছায়ায় দিন গুনে যায় :
যন্ত্রণা, নীল ফুল।

দুঃখের গাছ এখন বাড়ায়
চারিদিকে তার ডাল,
তাতে গান গায় সবুজ পাতায়
পাখি, বহমান কাল।

যন্ত্রণা-ফুল নীরব নিঝুম
কথা তার লোপ পায়,
গাছ বেড়ে ওঠে স্বর্গের তটে,
পাখি গান গেয়ে যায়।

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

রেখাচিত্র

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

এখনো লাবণ্য তার ঝরে প্রতি অঙ্গের শিখরে—
নরম রোদের মতো, অথবা নদীর মতো—জ্যোৎস্নার ভিতরে।
তবু সে তাপসী, যেন উৎসর্গিত কোনো দেবদাসী,
দেহের বিভঙ্গে লেখা—রিক্ত মন,—দীর্ঘ উপবাসী।

ধীর, শান্ত কথা বলে, চোখে স্নিগ্ধ প্রত্যুষের আলো,
প্রত্যন্তযৌবনা নারী, তবু কেন তাকে লাগে ভালো!
হেমন্তে শস্যের গুচ্ছ, কিংবা লতা—পীতাভ পাতায়
মনে আসে, দেখি তার অপরূপ দেহের আভায়।

বিস্তীর্ণ চিন্তার মতো মন তার, বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাস
অবিরাম অভিঘাতে ভেঙে যায়; তথাপি উদ্ভাস
যেন স্থির অজন্তার গুহাচিত্র: নির্জন নির্ঝরে
হৃদয়ের উৎসমুখ, কোন অন্ধকারে যেন ঝরে।

আমি তার বিস্মৃতির বাতায়নে নাম ধ'রে ডাকি,
সে তবু ছায় না সাড়া; প্রজাগর যন্ত্রণার পাখি।
যৌবনে আকাশলীনা, এখন সে নিজেই আকাশ;
আমার মাটির রাজ্যে ওঠে উষ্ণ হাওয়ার নিশ্বাস।

একটি কবিতা

অর্চন দাশগুপ্ত

পশমিনা রোদে মোড়া ঝকঝকে টারমাক চিরে
ঘাসের সুগোল দ্বীপ, জ্যামিতিক ফুলের কেয়ারি,
গান্ধার মূর্তির মতো স্বাস্থ্যবান ট্রাফিক-পুলিশ।

গাড়ির দুরন্ত স্রোত: অত্যন্ত মসৃণ কাডিলাক—
চশমার কালো কাচে কোনো মুখ ভাবলেশহীন,
অসম্ভব লাল ঠোঁট। অনেক পিছন থেকে আসে
বলদের গাড়ি আর এক ঝুড়ি দেহাতি যৌবন,
জরির জলন্ত বুটি, ঘোমটাতে দূরের সংগীত।

বৃদ্ধের মুদ্রায় তোলে শাদা হাত ট্রাফিক-পুলিশ,
সাময়িক শান্তি নামে অকস্মাৎ উজ্জ্বল মিছিলে—
যান্ত্রিক হৃদয়ে শুধু থরোথরো বন্দী গতিবেগ।

ক্রমান্বয়ে কাছে আসে নির্বিকার বলদের গাড়ি,
রাজস্থানি মেয়েদের স্পষ্টতর ফসলের গান।

প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে কাঁপে বারান্দায় বুগানভিলিয়া॥

তিনটি কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আলেখ্য

কেশে জানলা খুলে রাখি, চামরের স্বস্তি···এসো, হাওয়া,
লুটাও অতুলনীয় : কাঁপে জ্যোৎস্না গোলাপের বনে।
বাতায়নে চোখ রেখে তুমি যেন বোসো না, গোলাপ,
রূপের অসুখ, তাতে বেদনার দুঃখের মাধুরী।
আমি বহুদিন হ'লো ব'সে আছি ; হেমন্তের ব্যাধি
আমাকে দিয়েছে মৃত পরাগের বিলীন সম্পদ,
ক্ষয়ের অমরাবতী···ঝরা তার, ব্যর্থ ধ্বনি, হাত,
একান্ত মুখের স্বপ্ন, হায় চোখ প্রয়াসে নিরত
খুঁজে পাবে কোনদিন ? না কি ঐ অন্বেষণে তব
মহিমা প্রকাণ্ড হবে ? দুর্গমতা নিশ্চিত জীবনে
শেখায় সম্মান যেন রহস্যরে, যেন ভালোবাসা
আপন হারানো অংশ, গৌরব বা উজ্জ্বল সময়
অতীত, অপ্রাপ্য ; তাই তুমি, প্রেম, পূর্ণের রচনা
আত্মশিল্পে ; তুমি বোসো সম্ভ্রান্ত প্রতিভা পাশে নিয়ে
শিয়রে, চোখের কাছে, আরো নিচে হাঁটুর ফেরানো
চাদর সরিয়ে, কাছে, দৈহিক, দূরত্ব ঢেকে, কাছে—
শোও, জানলা খোলা থাক, বাতায়নে যেয়ো না, গোলাপ ;
বড়ো সুখ, বড়ো দুঃখ এই মিশ্র আলেখ্যের ছায়া।

প্রভাত

কে ডাকলে আমায় ঘুমে, ভূত ? প্রেম, বৈদিক ঘোটকী ?
অর্ধেক ফলের স্বপ্ন পূর্ণ হ'লো, তবু জাগরণে
সন্ধানের হাতে পায়ে আঙুলে জড়ানো সে কি চুল ?

স্বপ্নেরই পুরোনো কূপ, তার গ্রন্থি, নিঃসৃত আঁচল।
জীবনের এক পায়ে লাল কাঁটা, অন্যটি অক্ষত
আপন আনন্দে যাবে একবার পাখির মতন
আকাশে, অনেক দূরে···স্বপ্নে যায় ; যদি ডাক শোনে
অন্তিমে মড়ার মাথা কোলে নিতে ঝাঁপায় সতত।
ভূত ? গ্রীবা দাও, দেহ স্বচ্ছ, নামে বিখ্যাত প্রণয়,
চুম্বন, ভয়াল শয্যা, ঢুকে যাই, উজ্জ্বল উত্তাপে···
রোমে-রোমে, সারা দেহে শুয়ে থাকি, এ-ই প্রেম, সব···
প্রাকৃত সৌন্দর্য ঢোকে, সব মাছ, উন্মত্ত গোধূলি,
সব, সব···সুখ, দুঃখ, পতন, সম্রাট, বেড়ালেরা···
কে ভাঙলে আমার ঘুম, ভূত ? প্রেম ? বৈদিক ঘোটকী ?

দেবদূত

যে-বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনব্যবহিত কর হ'তে
তোমাতেই ফিরে যায়, গাঁথা বুকে বাগানের দাগ।
সেই বৃক্ষ তুমি, তব কণিকারে কেমন প্রভেদ
দেবে ; বিস্ময়ের মধ্যে দুই চিত্ত সমভগ্ন ভূমি ?
একদা তুমিই বৃক্ষ, অনুপস্থিতি কি পল্লব ?
শাখায় পাতায় ভরা বৃদ্ধি তার তোমার আভাস···
মনে হয় অদৃশ্যের কোনো পাতা ছুঁলো বনে মেঘ,
কোনোটি নিষ্ক্রান্ত যেন আকাশের অতল নিরিখে।
বুঝি ব্যাপ্ত তব জ্ঞান, মনে হয় জানো না কিছুই
আরো অন্তরঙ্গভাবে ; কোনো পাতা মানুষের মতো
ভোলালো মুখোসে, রূপে, কাল্পনিক নৈরাজ্যে নিজেরে ;
তারপর সুখে মৃত্যু, বুকে পচে সন্নিধান-আশা।
সব, সব জানো তুমি, তোমায় অদেয় কিছু নেই ;

আছো সঙ্গ হ'তে দূরে ; কোথায়, হে জননীজনক
প্রেমের সর্বস্ব ধন ? বাঁধি মোর খড়মূলে পাতা,
সাজাই তোমার বৃক্ষ অনুপম মিলনবিন্যাসে ;
ভুলে থাকি শিল্পে, মোহে, নীচতায়, রুগ্ন জড়দেহী—
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে দেবতা, যদি সখা তার ?

পনেরো বছর পরের জন্য

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কে কী রকম বেঁচে আছে, জানতে ইচ্ছে করে।
যে-তিনটে লোক সাফল্যের কুড়োল হাতে নিয়ে
শব্দ ক'রে বন কাটতো, তারা এখন কোথায়—
একজন তো রীতিমতো সাজানো সংসারী
গোবরডাঙায় বাড়ি উঠছে মাঝারি দেড়তলা,
অন্য দুজন অঙ্ক কষতে পেরেও যেন দশমিকের ভুলে
শেষের ধাপের করুণ কাটাকুটি।

কিন্তু আমার ব্যঙ্গ করার কী অধিকার আছে ?
আমি বরং কৃতজ্ঞ যে, আঘাত দিতে এসেও ক্রমাগত
ওরা আমায় অন্য কিছু জুগিয়ে এসেছিলো ;
আমি ওদের শাদা কি নীল রঙে
ভাগ করতে জেনেছিলাম। শাদা কি নীল রঙে
কত ইতর দুর্ঘটনা আমার হাতে সুশ্রী হ'লো, ভাবো !

এখন আমি যে-ঘরে যাই, তারও নিজের জয়পতাকা নেই
কেউ ভাবে না, মিহিজামের মহারাজা থাকেন—
কিন্তু আমি অন্ধকারে যে-অবিরল বৃষ্টি শুনে ফিরি
তাকে, আমার রক্তে ছাড়া, অন্য কোথায় হিসেব দিতে হবে !

বুঝতে পারি না যে, আমরা কেনই বা যতদূর সম্ভব গভীরভাবে আত্মস্থ হবো না।' মালার্মের কবিতার নিখুঁত, সশ্রম শিল্পকর্মের পরিচয় পেয়ে এই কবিই একবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন : 'যদি আমি কখনো লিখি, তবে স্বপ্নাবেশে আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে মহৎ কিছু রচনা করবার চেয়ে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে ও ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিকৃষ্টতর কিছু রচনা করাও আমার পক্ষে বরণীয় হবে।··· কারণ দৃঢ়তার সঙ্গে পরিকল্পিত, বহুবিধ মানসিক সংকটের মধ্যে, বিধিবদ্ধভাবে অন্বেষিত, এবং পূর্বনির্ধারিত কতগুলি শর্তের নির্মম বিশ্লেষণের পর যে-রচনার উদ্ভব, তার মূল্য যা-ই হোক, স্রষ্টার চিত্তকে পরিবর্তিত না-ক'রেই পারে না, এবং তা নিজেকে উপলব্ধি করতে ও পুনর্বিন্যস্ত করতে সাহায্য করে।··· পরিশ্রমের ফল, তার জাগতিক আবির্ভাব বা প্রভাব নয়, শুধু মাত্র যে-উপায়ে আমরা লক্ষ্যে পৌঁচেছি তাই আমাদের পক্ষে সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ।···শিল্প এবং তার সমস্যা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করে; কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী এবং সৌভাগ্য নিতান্তই চঞ্চল, কাছে এসে বারে-বারেই তারা ছেড়ে দিয়ে চ'লে যায়।' একটু বাদেই পরিমার্জনার কঠোরতা, প্রত্যাখ্যাত সমাধান, অস্বীকৃত সম্ভাবনা, অসন্তোষের প্রকৃতি ও শিল্পীর বিবেক প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলছেন : 'এখানেই সাহিত্য নীতিশাস্ত্রের সীমানায় পদার্পণ করে, এবং স্বাভাবিক ও পরিকল্পিতের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটে, আর এখানেই অতি-সহজের প্রতিরোধে বীর এবং শহীদদের আবির্ভাব। কখনো প্রকাশ হয় নৈতিক শক্তির, কখনো বা ভণ্ডামির।'

বুদ্ধদেব বসুর শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং কোনো অস্পষ্ট জীবন-দেবতা বা দৈবশক্তি নয়, তাঁর মতে স্মৃতিই সৃষ্টির আরম্ভ ও কারণ। ইয়ুং-এর মতেও এক রহস্যময় রাত্রির জগৎ প্রেত, রাক্ষস ও দেবতার লীলাভূমি, এবং কবির পরাদৃষ্টিতে অন্তর্জগতের এই অন্ধকার অংশই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। 'আদিম অভিজ্ঞতাই সৃষ্টির উৎস।' ইয়ুং অন্যত্র আরো স্পষ্ট ক'রে এরই নাম দিয়েছেন 'সামূহিক নির্জ্ঞান' (collective unconscious), অর্থাৎ বংশগতির প্রবাহে গঠিত এক ধরনের মানসিক সংস্কার। মনোজগতের এই

অতলেই মানবসন্তানের আদিম অভিজ্ঞতা স্তরে-স্তরে সঞ্চিত, এবং বুদ্ধদেবের কবিতায় 'প্রাগৈতিহাসিক নীলিমা', 'মাতার গর্ভ', 'মূর্ছার কন্দর' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দবন্ধে এই রহস্যময় অন্ধকারেরই একটা বর্ণনা দেবার প্রয়াস দেখি। জঁা-পল সার্ত-এর একটি তত্ত্বও অনুরূপ কথাই বলে—কিন্তু অন্য ভাবে :

'মানুষের অস্তিত্বের শুরু হয় এক বিশ্বসত্তার অংশরূপে। এ-অবস্থায় তাকে মৌল সত্তা ব'লে অভিহিত করতে পারি। এই মৌল সত্তায় সকল সম্ভাবনাই সুপ্ত থাকে যা ব্যক্তিসত্তা কাজে লাগাতে পারে। ব্যক্তিসত্তা নিয়তই তার মৌল সত্তায় নিহিত সম্ভাবনা থেকে শক্তি আহরণ করছে। মাত্র এ-ভাবেই সে বাঁচতে পারে—চিন্তা বা কাজ করতে পারে, চলতে পারে।' নিজের মৌল সত্তায় নিহিত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষাই বুদ্ধদেবের কবিতায় অভিব্যক্ত, অন্তরালে যে আছে তাকে দেবতা, শয়তান বা 'অন্তর্যামী' যা-ই বলি না কেন, আসলে সে 'নির্জ্ঞান মন'—যে কবির সমস্ত উচ্চারণকে এক গভীর উদ্দেশ্যময়তায় ভ'রে দেয়। কিন্তু স্মৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সামান্য অংশই শিল্পকর্মে প্রকাশিত হ'তে পারে; অথচ শিল্পীর পক্ষে এই গুপ্ত শক্তির মূল্য তাঁর সজ্ঞান অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি :

'আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক।'

এবং এই অন্ধকার-লোকে কম্পন না-জাগলে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয় :

'তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা···'

অতএব, গভীরতম অন্তর্জগৎই শিল্পের প্রকৃত প্রেরণা—ছন্দ, মিল, ধ্বনি, তারই 'প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত'। এই চরম উৎস থেকে শক্তি আহরণ করতে হয় কবিকে—সেজন্য, সহজিয়াদের মতো, তাঁকেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে ভুলে গিয়ে পৌঁছতে হবে সমস্ত গতির পারে—'যেখানে মলয়/ ম'রে যায় বরফের ষড়যন্ত্রে' আর সেখানেই সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে তাঁর নিজস্ব জগৎ—সচেতনভাবে : 'প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।' বুদ্ধদেব বসুর মতে

পরোপকার, কোনো কর্মপন্থীর অনুসরণ, বা জনগণের উন্মাদন শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য নয়। পরোৎকর্ষে পৌঁছনো—একটি নিটোল আপেলের মতো ফ'লে ওঠাই শিল্পীর একমাত্র সাধনা। শিল্পের জাগতিক প্রভাব কিছু থাকলেও (অবশ্যই আছে) সেটা আপতিক—'স্নান, যান, ধানখেতে কিছু এসে যায় না নদীর।' তার আছে শুধু অনবরত অবসান আর আরম্ভ—অতএব, শিল্পীকে আশ্রয় নিতে হবে তাঁর নিজের মধ্যেই, এক 'অনাক্রমণীয় দুর্গে':

'হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।'

পোল ভালেরির একটি রচনায় সুন্দর বর্ণনা আছে কবির এই আত্মমগ্ন অথচ জাগ্রত অবস্থার:

'বুদ্ধি, সতর্কতা স্বপ্নের জন্ম দেয়;
ঘুমের মধ্যেই স্পষ্ট দেখতে পাই;
চিত্রকল্প আর ছায়া—তারাই তাকিয়ে থাকে;
অভাব এবং শূন্যতায় সৃষ্টির উদ্ভব।'

অর্থাৎ শূন্যতার অন্ধকারেই সুষুপ্ত সব সম্ভাবনা—বিপরীত সব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, স্বর্গের পিপাসা আর মর্তের আকর্ষণ; অতীত এবং ভবিষ্যৎ, শিল্পের কাজ সমস্ত বিভিন্নতা আর বৈপরীত্যের সমন্বয়-সাধন:

'সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবরযুবতী।'

২

'দ্রৌপদীর শাড়ি'-র একটি কবিতায় বুদ্ধদেব দুই পূর্ণিমার তুলনা করতে গিয়ে 'সহজে খুশি হ'তে-না-জানা সমালোচক মন'-এর জন্য অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর'—এই পংক্তির পুনরুক্তির মধ্যেও জীবন ও সৃষ্টি থেকে সহজের বিলুপ্তির জন্য একটি দীর্ঘশ্বাস যেন শোনা

যায়। আসলে, সচেতনভাবে শিল্পকে আয়ত্তে আনতে চাইলেও সহজের প্রতি একটা আকর্ষণ বুদ্ধদেবের আছে, এবং এ-বইয়েরই কয়েকটি কবিতায় আমরা তাঁর পুরাতন আবেগ-প্রাবল্যের পরিচয় পাই। 'দেবযানীর স্মরণে কচ: ২, ৩, 'অনুরাধা', 'প্রেমিকের গান'—এই ক-টি কবিতার সৌরভ অন্তত ত্রিশ বছরের পুরোনো। কিন্তু 'সমর্পণ,' 'যাওয়া-আসা,' 'সমুদ্রের প্রতি'—এই তিনটি কবিতায় প্রেম ও বেদনা এক বিরল ও বিচিত্র সংগীতের রূপ নিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু সাধারণত সংরাগ-তীব্রতা ও মিলন বা মিলনাকাঙ্ক্ষার আনন্দকেই ব্যক্ত করেন প্রেমের কবিতায়, কিন্তু এই কবিতাগুলিতে অস্থিরতার সঙ্গে এমন একটি শান্ত রস আছে, যা শেষ পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে প্রমাণ করে 'দুঃখের সংগীতই এ-জগতে মধুরতম।'

মহাভারতের কাহিনীর রূপান্তরণে বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্য এবং শিল্পসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই সুপ্রকট। রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যবহার করেছেন সাধারণত নৈতিক কোনো উদ্দেশ্যে, বুদ্ধদেব শিল্পতত্ত্বের রূপক হিসেবে অথবা অ-নৈতিক কোনো মানবিক সত্যকে রূপ দেবার জন্য। দু-জনেই অবশ্য কচ-চরিত্রকে উন্নত করেছেন: 'যেন ত্রিভুবনে কোথাও উজ্জ্বল। হ'য়ে ফুটে থাকে চিরকাল তার চোখ'—রবীন্দ্রনাথের কচও এ-কথা বলতে পারতো। কিন্তু বুদ্ধদেবের কচ আরো একটু অগ্রসর হয় এবং 'বিদায়-অভিশাপ'-এর কচের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রার্থনাই সে উচ্চারণ করে—অর্থাৎ দেবযানীকে বিস্মৃতির বর সে দেয় না, বরং কচের স্মৃতি তার 'চোখের আলো তরল ক'রে দিক' এই মানবিক আকাঙ্ক্ষাই তার কথায় ব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথের কচ একজন রক্ত-মাংসহীন আদর্শ মাত্র। প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে (যা মহাভারতে নেই) তিনি তীব্রতা সঞ্চার করতে পারেন নি। একটুও হৃদয়-দ্বন্দ্বে বিচলিত না-হ'য়ে বিদায়-কালে মাত্র দুটি পংক্তির সংক্ষিপ্ততায় কচের সদিচ্ছার সপ্রতিভ উচ্চারণে মহৎ ভাবালুতা প্রকাশ পেলেও প্রেমের সুর লাগে নি। কথা ক'টির ক্ষিপ্রতা এবং অনায়াসনৈপুণ্য বরং এক অ-মানবিক ঔদার্যের জন্যই নিষ্ঠুর।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষাও নাটকীয়, যন্ত্রণার উপযুক্ত বাহন। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি

চিত্রকল্প, ভাঙা-ভাঙা পংক্তি এবং টুকরো-টুকরো কথায় তিনি যে-ভাবে কচের সংরাগরক্ত যন্ত্রণাকে উপস্থিত করেছেন তাতে কচ সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ থেকেই সম্ভবত তিনি সূত্র পেয়েছিলেন; কচের 'বিদ্ধ মৃগসম' কথাতে যা আভাসে ছিলো কিন্তু স্পষ্ট হয়নি, বুদ্ধদেব তাকেই পরিস্ফুট করেছেন। অবশ্য অন্য দুটি কবিতায় নাটকীয় নৈর্ব্যক্তিকতার বিশেষ অসদ্ভাব, যেন কচ ও দেবযানীর ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত প্রেমের আকৃতিকে প্রকাশ করাই কবির লক্ষ্য।

এ-সমস্ত ক্ষেত্রে 'কঙ্কাবতী'র সহজ আবেগপ্রবাহের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ ঘটলেও, অধিকাংশ কবিতায় বুদ্ধদেব এক কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধীন। বস্তুত, ভাষা ও আবেগের উপর ক্রমিক আত্ম-কর্তৃত্ব স্থাপনই তাঁর কাব্য-জীবনের ইতিহাস, এবং এই সূত্রেই বুদ্ধদেব বসুর চরিত্রের পরিমাপ সম্ভব। শিল্প-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে কবি হৃদয়াবেগকে এক কঠিন ও সংহত রূপ দিতে সচেষ্ট, 'মরুপথ'-এ সৃষ্টির আনন্দকে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন বস্তু-প্রতি-রূপের সাহায্যে :

'তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর
বীজাণু ছড়িয়ে দেয়, সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফ'লে ওঠে ফল,
এবং দর্শনস্নিগ্ধ কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সন্ধ্যার আজান।'

৩

সাম্প্রতিক কালে প্রত্যেক কবিই নিজের ঘর্মের বিনিময়ে জানেন যে এই মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রসার ও শিক্ষা-বিস্তারের যুগে কবিতার ভাষাকে সপ্রাণ রাখা কী কঠিন সমস্যা, কেননা কোনো একটি শব্দের প্রচলন এখন পূর্বের তুলনায় সহস্রগুণ বেশি। শব্দ অবশ্য ঠিক মুদ্রা নয়, কারণ মুদ্রা হাতে-হাতে ঘুরে ব্যবহারের অযোগ্য হ'য়ে যায়, কিন্তু শব্দ সাময়িকভাবে অপ্রচলিত হ'লেও তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব। যেহেতু কাব্য শব্দোপায়ী, প্রত্যেক আত্মসচেতন কবিকেই কবিতার ভাষাকে সজ্ঞানে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়, এবং শব্দ সম্বন্ধে অসন্তোষ

সহজে ঘুচতে চায় না। বুদ্ধদেব বসু প্রত্যেকটি শব্দ, এমনকি ছেদচিহ্ন সম্বন্ধেও অত্যন্ত সতর্ক, এবং তাঁর কবিতায় যে-বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা তার সজীব শব্দপুঞ্জ। অবশ্য 'অসহনীয়', 'সপ্রতিভ', 'গতানুগতিক' প্রভৃতি গন্ধগন্ধী বা আবেগ-দ্যোতনাহীন বিশেষণ, এবং 'সারাৎসার', 'বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রয়োগে বুদ্ধদেব জীবনানন্দ দাশের অনুগামী, এবং দু-এক জায়গায় জীবনানন্দের কবিতার সুপরিচিত অংশ অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হয়েছে নতুন শব্দ বা শব্দবন্ধে: 'শুনেছি 'অমৃতকণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান,—এখানে 'অমৃতকণ্ঠ' শব্দবন্ধটির সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত জীবনানন্দ দাশের 'অমৃতসূর্যে'র 'অমৃত' ও 'কিন্নরকণ্ঠে'র 'কণ্ঠ' কবির মনে সংযুক্ত হ'য়ে গিয়ে। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৌলিকতা অধিকতর প্রকট 'মলয়', 'পুলিন' প্রভৃতি ম্লান কাব্যিক শব্দের পুনরুজ্জীবনে। একটি সার্থক পংক্তি বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কারুকর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

'কামনার সান্দ্র আবেদনে
জলেছি সম্মত ধূপ হাজার শয্যায়…'

'সান্দ্র' প্রভৃতি দুরূহ তৎসম বিশেষণ আধুনিক কালে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া অন্যত্র বিরল হ'লেও আলিঙ্গনের নিবিড়তা বোঝাবার জন্য এমনি একটি কঠিন অনুপ্রাস এবং ধ্বনিময় যুক্তবর্ণের প্রয়োজন ছিলো এখানে। শব্দটির অভিধানিক অর্থ (১) নিবিড়, (২) গাঢ় ও তরল (viscous) এবং কামের প্রসঙ্গে উভয় অর্থই গ্রাহ্য। 'সম্মত' আর 'ধূপের' সন্নিপাত বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব এবং অপ্রত্যাশিত; ধূপের মৃদু, কোমল সৌরভের দ্যোতনা আছে এই বিশেষণটিতে। ধূপের সার্থকতাও বহুবিধ: শুধু যে কামই সুরভিত হ'য়ে উঠেছে এই তুলনায় তা-ই নয়—এই শব্দটির উদ্ভাসনে সম্পূর্ণরূপে সেই পুরোনো কালটি বেঁচে উঠেছে যখন কামসেবা নিছক একটা জৈব ব্যাপার না-থেকে রীতিমতো শিল্পকলায় পরিণত হয়েছিলো—যার পরিচয় আমরা পাই বাৎস্যায়নের কামসূত্রে।

৪

বুদ্ধদেব বসুর শিল্প-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি কবির বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উৎকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করলেও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। 'মাছের ঝোল', 'বাথরুম', 'ট্র্যামের হাতল' প্রভৃতি দৈনন্দিন বস্তু বা ঘটনা পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়েছে 'নক্ষত্র', 'ফুল', 'নীলিমা' প্রভৃতি প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। বাস্তবজীবন ও গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এমনি অজস্র চিত্রকল্প, অভিজ্ঞতা বা ইতস্তত জীবন-ভাষ্যের জন্য সনেটের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে কবিতাগুলি একটা ঘনত্ব ও বিস্তার লাভ করেছে; ফলে কবিহৃদয়ের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের এক ধরনের সংযোগ-স্থাপন এখানে সম্ভব। এবং বহিরঙ্গের জন্য ততটা নয়, এমনকি বহু মৌলিক মিলের জন্যও নয়, যতটা এই কারণেই সনেট বুদ্ধদেব বসুর হাতে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হ'তে পারে নি। সনেট-রচনায় কবি যে-স্বাধীনতা নিয়েছেন কখনো চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমা অতিক্রম ক'রে, কখনো পর্বে 'যখন মরীচিকার' বা 'মৃগয়া, বনভোজন'-এর মতো তিন-পাঁচ বা তিন-দুই-তিন মাত্রার সংস্থানে, অথবা প্রচুর ছেদচিহ্নের ব্যবহারে, যার ফলে কোনো-কোনো লাইন টুকরো-টুকরো হ'য়ে গিয়ে ছন্দের বৈচিত্র্যসাধন করেছে, সেটা অনেকেরই হয়তো মনঃপূত হবে না। কিন্তু বহিরঙ্গের নমনীয়তা সত্ত্বেও সনেটের যা অন্তঃসার, অর্থাৎ ভাবগত ঐক্য, এবং একটিমাত্র ভাবের ক্রমিক বিবর্তন—সেটা সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে। 'রাত তিনটের সনেট : ১' কবিতাটির দ্বিতীয় চতুষ্কে কবি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা দ্রুত, উত্তেজিত তর্কের ভঙ্গি এনে ফেলেছেন ('যীশু কি পরোপকারী/ ছিলেন, তোমরা ভাবো?'), অথচ এতৎসত্ত্বেও কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে নি, যেহেতু এই পংক্তিগুলি মূল বক্তব্যেরই পরিপোষক। যদিও বুদ্ধদেব বসুর হাতে এই কাব্যরূপটি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রেম, নিসর্গ-প্রীতি বা দেশপ্রেমের পরিবর্তে আত্মমগ্ন জটিল চিন্তার বাহন, তবু, যেহেতু কবি হৃদয়াবেগে আন্দোলিত হয়েছেন মস্তিষ্কচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে, এই কবিতাগুলি নীরস তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে চিন্তা ও

আবেগের স্ফটিক-কঠিন সমন্বয়ে এক অপরূপ রসসৃষ্টি। উপরন্তু, প্রধান বিষয় শিল্পতত্ত্ব বা প্রেম হ'লেও চিত্রকল্প, প্রতীক বা পটভূমিকারূপে নিসর্গবর্ণনার অভাব নেই তাঁর কবিতায়। অবশ্য এ-বইয়ের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল অনেক ক্ষেত্রেই বৈদেশিক, এবং একটি কবিতায় 'রবিন' পাখির উল্লেখ দেশীয় পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভবত অস্বস্তিকর। কিন্তু আধুনিক যুগে এ-ধরনের বৈদেশিকতায় আপত্তি করার কোনো কথাই ওঠে না।

'টোয়েলফথ নাইট'-এর নায়িকার মতো কবিতারও জন্ম নাকি একটি নৃত্যচঞ্চল নক্ষত্রের উদ্ভাসে। বুদ্ধদেব বসু কিন্তু স্মৃতিকেই দেবী ব'লে মেনেছেন, তারই আলো আর শিশির ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। তাঁকেই বন্দনা করেছেন তিনি নানা ভাবে—দুঃখে, প্রেমে, হতাশায়। কিন্তু এ-বইয়ের প্রধান সুর নির্বেদের; শান্ত মনে সব কিছু মেনে নিয়ে শিল্পকর্মে ডুবে যাবার, বেদনাকে গানে রূপান্তরিত করবার সাধনাই, কবির পক্ষে, একমাত্র উদ্ধার। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ যৌবন আর মধ্যবয়স, অতীত এবং বর্তমান, যেন দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে—আসন্ন সন্ধ্যার দিকে চোখ রেখে। 'তোমায় আমি রেখে এলাম ঈশ্বরের হাতে।' (এখানে 'ঈশ্বর' শুধুই কি বাক্যালংকার?) এমনি অনেক পংক্তি ঘুরে-ঘুরে মনে আসবে পাঠকের। 'যে-আঁধার আলোর অধিক' এক গুচ্ছ স্মরণীয়তা।

দুটি কবিতা

অস্থির

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

অস্থির হাওয়ায় কাঁপে গাছ, শান্ত ঘর।
সন্তদের দিন নেই—আর সৌম্য মহত্তমদের
ঝলসে গেছে মুখ সেই দানবিক যুদ্ধের আগুনে
যার গল্প করবেন আমাদের আরো দীপ্ত কোনো বংশধর।

জানি এই রক্তাক্ততা হাতে নিয়ে তবু
আমাদের অধিগত বহুবিধ চমকপ্রদ দান :
হেলিকপটারে চ'ড়ে কৃষ্ণ নামে চুপি-চুপি ছাতে,
ফ্লেমিং-কে ধন্যবাদ—যে রেখেছে ফুতির সম্মান।

কে তোমার বুকের গাগরি থেকে সুধা চুরি ক'রে
উড়ে গেলো ? কুয়াশার কাচে ধীরে স্পষ্টতর বন ;
বেছে নাও ঝলোমলো পাখির উৎসাহে তুমি ফের,
মস্ত এক বাড়ি যার, পদস্থ যে, বহু লোকজন।
হ'য়ে যাও প্রজাপতি (এক প্রেম এঁদো জলে মরে)।
কেন তোড়া হাতে নিয়ে সনাতন সত্যশ্রীলতার ?
যদি থাকে মনোভাব শুভ্র কিছু অসুস্থতার,
জড় চিত্রে রূপ নাও—ঠাণ্ডা ফল কিংবা কল্‌সি স্থির তার করে।

'সমুদ্রে ছিলো না কিংবা আভাসিত যে-আলোর কথা
কবি আর মরমীরা গান গেয়ে বলেন সহজে,
সে কোথায় ?' একটি লোক হেসে উঠলো অন্ধকার যেন,
কাগজের ফুলে যার চিমসে হাত অলৌকিক খোঁজে।

'যদি থাকে'—একজন পানাসক্ত দীর্ণকণ্ঠে বলে,
'তবে কেন জগৎ বদলে যায় যকৃতের ক্রিয়া ভুল হ'লে ?'

খাকি-প্যাণ্ট মেয়েটির ক্লান্ত মুখচ্ছবি
ছড়িয়ে দিয়েছে বিষ অন্তহীন দূর নীলিমায় ;
সকালে নিস্তেজ সূর্য দীর্ঘসূত্রী লতিফের মতো ;
আকাশে মেঘের মতো মূল্য আজ পরিবর্তমান।

রোমান্টিক

বৃষস্কন্ধ, অকপট, ৬-১ উঁচু,
হ্রস্বদের পৃথিবীতে যাকে বলা চলে 'একজন'—
রাইফেল কাঁধে নিয়ে মুখোমুখি বুনো হাতি মেরে
পার হ'য়ে যেতো নদী, তারাভরা সেগুনের বন।

ঝলসানো হাঁস, মদ, সবুজ তরকারি, কাঁচা ফল,
এই তার সান্ধ্যভোজ ক্লান্ত হ'য়ে ঘরে ফিরে এলে ;
বড়ো-বড়ো অনুভবে চোখ ভ'রে দেখা দিতো জল
ফের রোদ হেসে উঠতো সহজেই মেঘ ভেসে গেলে।

ঝিনুকের হাত নয়—রোমশ নারীর
স্পর্শ তার উদ্ভাসিত প্রিয় ঝংকার ;
রঙচঙে জামা প'রে হোমরের গ্রন্থ থেকে বীর
সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে যেন করে দানব শিকার।

তার মুখে গল্প শোনো : বন্ধু তার, শান্ত ভদ্রলোক,
বয়স ত্রিশের কাছে, কবিতার মতো কথা বলে,
শ্যাম্পু-করা চুল, দুটি ময়নার মতো কালো চোখ,
আত্যন্তিক কল্পনাপ্রবণ তাকে জানতো সকলে।
নবোঢ়ার তাজা বুক, রাত্রিগুলি তার,
ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো রোমাঞ্চক ফুলের জগতে
নাইটিঙ্গেল হ'য়ে এক—দুটি নম্র, কেঁপে-ওঠা হাত
জানালো গভীর ইচ্ছা—রক্তের আলোড়ন—তবু কোনো মতে॥

অথচ সে বুঝলো না। শুধু আকস্মিক
প্রেরণায় জানলা খুলে যেন কোনো আশ্চর্য অসুখে
চেয়ে থাকে—চিত্রার্পিত। তারপর সেই রোমান্টিক
এক চামচে জ্যোৎস্না তুলে ধরে তার প্রেমিকার মুখে।

নায়িকা-কে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দ্রৌপদী, হেলেন নও, ট্রয় কিংবা কুরুক্ষেত্র আর
কখনো জলবে না রূপে, মহাকাব্য লিখবে না কেউ,
আলোর আসঙ্গে এসে চুপিচুপি ফিরবে অন্ধকার
শরীরের দুটি তীরে আযৌবন দোলা দেবে ঢেউ।

অভিসারিকার বর্ণ বহুরূপী প্রাণের নির্জনে,
ঐকান্তিক অনুভবে যদিও তা নিতান্ত নিরেট
অবিরল জলধারে হঠাৎ কখনো আনমনে
রক্তের অক্ষরে শুধু লিখে যাবে একটি সনেট।

নগর ঘনায় চোখে—রাত-জাগা নটীর নূপুর
আচ্ছন্ন রোগীর মতো দিনরাত শুনি কান পেতে,
কয়েকটি দুঃস্বপ্ন এসে হত্যা করে বিবর্ণ দুপুর
অতর্কিত দেহমন সমর্পিত তোমার দু'হাতে।

কিছুই অদেয় নেই সমুচিত সুস্থ প্রতিদানে
অঙ্কের নিয়মে ঠিক হিসাব মিলানো দূরে কাছে,
জীবন খেলনা নয়, দুগ্ধপোষ্য শিশুটিও জানে
বোকারা যদিও ভাবে দৃশ্যান্তরে অন্য কিছু আছে॥

কয়েকটি টি ওলেট

সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১

মাঝে-মাঝে মনে হয় তুমি এক স্বপ্নের সারস :
কেন যে আমার হাতে উড়ে-উড়ে বন্দী হ'তে এলে !
ছিলে মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত, অন্তহীন ডানার সাহস
কোথায় এনেছে, ছাখো। হায়, তুমি স্বপ্নের সারস !
অথচ আছো তো বেশ। পা ছড়িয়ে দুই চক্ষু মেলে
পশমের জামা বোনো। নেই রাগ বিদ্বেষ আক্রোশ।
রূঢ় সত্য তবু এই : তুমি এক স্বপ্নের সারস।
কেন যে আমার হাতে উড়ে-উড়ে বন্দী হ'তে এলে !

২

কিছুই মনের মতো নয় !
এমন কি তুমি—তুমিও না।
এ আমার অগাধ বিস্ময় :
কিছুই মনের মতো নয়।
সাগর না, মরুভূমিও না—
হে আমার আশ্চর্য হৃদয় !
কিছুই মনের মতো নয়,
এমন যে তুমি—তুমিও না॥

৩

শূন্য মন। একলা ঘর। ব্যথার ভার।
অন্য ডালে পাখিরা আজ বাঁধলো বাসা।

স্মৃতির দাঁত চিবিয়ে ছেঁড়ে অন্ধকার।
শূন্য ঘরে একলা মন : ব্যথার ভার।
শাদা-কালোর ছকে যারা খেললো পাশা—
খিলখিলিয়ে রাখলো কালের অঙ্গীকার।
শূন্য ঘরে একলা মন : ব্যথার ভার :
অন্য ডালে পাখিরা আজ বাঁধলো বাসা॥

৪

হাতে হাতে রাখি, জ্ব'লে ওঠে বিদ্যুৎ—
মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ।
ঘুরে-ফিরে আসে প্রাক্-প্রালয়িক দূত :
হাতে হাতে রাখি, জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎ।
রক্তে বিপুল হর্ষ :
দ্যুলোক ভূলোক মূর্ছিত, অবলুপ্ত পঞ্চভূত !
হাতে হাতে রাখি, জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎ—
মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ॥

৫

বৃষ্টি, বৃষ্টি। অন্ধকার। নির্জন দুপুর।
কঠিন দুয়ার রুদ্ধ। কে ডাকে, কে ডাকে ?
শত শত শতাব্দীর নিঃশব্দ নূপুর !
বৃষ্টি, বৃষ্টি। অন্ধকার। নির্জন দুপুর
করুণ রঙিন মুখ, ম্লান চোখ, আঁকে।
এলোমেলো হাওয়া। চুপ। অতলান্ত স্বর।
বৃষ্টি, বৃষ্টি। ছায়াচ্ছন্ন নিষ্ঠুর দুপুর।
রুদ্ধ দ্বার কেঁপে ওঠে : কে ডাকে, কে ডাকে ?

দুটি কবিতা

সরল বৃত্তে

বংশীধারী দাস

সকাল থেকে সন্ধ্যা তার
গড়িয়ে যায় বিলম্বিত লয়ে,
কিছু আলোর সফলতার
অভীপ্সিত সুখী সময়ে
জীবন তার নিরুদ্বেগ,
লাগে না পালে অবিমৃষ্য হাওয়া ;
আকাশে নেই কুটিল মেঘ
দুঃসাহস করে না তাকে ধাওয়া।

ছোট্ট এই বৃত্তটার
সকল রেখা চিনেছে নির্ভুল,
বাইরে গাঢ় অন্ধকার
অথৈ জলে ছাখে না কোনো কূল,
বাইরে যত দ্বন্দ্ব আর
অন্তহীন জটিলতার ভয়,
রাত্রিদিন যন্ত্রণার
আগুনে পুড়ে দেখবে সংশয়।

মোমবাতি

যেহেতু সে চিন্তাশ্রয়ী জীব
চিত্ত তার রক্তের মতন
এবং যেহেতু চিন্তা কখনো অধীন
হয়নি, হবে না কারো, বরং উদ্‌গ্রীব

বাধাহীন
স্বকীয় যুক্তিতে,
ব্যক্তিহীন সমষ্টির কল্যাণগাথায়
আগ্রহী হবে না তার মন।

যেহেতু চিন্তাই তার একমাত্র সাথি
শান্তি নেই মিছিলের ভিড়ে,
ফলত শিবিরে
সে জ্বালাবে অস্তিত্বের শীর্ণ মোমবাতি
নিঃসঙ্গ আঁধারে,
অতন্দ্র প্রহরী হ'য়ে জাগবে সে দ্বারে।

তিনটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

এখন দুপুরবেলা

কোনো কিছু শব্দ ক'রে বাজে না এখানে ;
ঘড়ি কি জীবন, কিংবা যৌবনের স্তিমিত বিষাদ
কিছুই কাঁপে না ঐ প্রতিবেশী ছায়ার বাগানে।
এখন দুপুরবেলা চতুর্দিকে রৌদ্রের বিস্তার ;
দু' একটা পাখির ডাক যতোদূর আমাদের ডাকে,
তারই সন্নিকটে কেউ ঘুমিয়ে রয়েছে।
আমি তার মুখ দেখে প্রতিদিন সময় জেনেছি।
দেখেছি বিকেলবেলা তার নিত্য প্রসাধনে সেজে
আমাদের নিয়ে গেছে পুরাতন স্বপ্নের প্রাসাদে।
সেখানে যা-কিছু ছিলো, তাদের নিহত বিম্ব আজো
জলের ভিতর মগ্ন গুচ্ছ-গুচ্ছ শ্যাওলার মতো প'ড়ে আছে।
সেই সব মৃতদেহ, যারা একদিন এই বস্তুর জগতে
খণ্ড-খণ্ড ইট কাঠ পাথরের ছায়া হ'য়ে ছিলো,
তাদের সে-সব স্থিতি আজ অন্য মণ্ডলের দিকে।
ক্রমশ সূর্যের তাপ গোধূলির নির্জন প্রান্তরে
এ কী শোকাবহ মূর্তি গ'ড়ে তোলে আমাদের নিঃসঙ্গ প্রবাসে।

এখন দুপুরবেলা, কিন্তু তার অন্য অভিপ্রায়
এখনি উন্মুক্ত হ'য়ে যদি এই প্রকাশ্য আলোকে
হ'তো এক অবিশ্বাস্য মায়াবী দর্পণ,
যেখানে কিছুই আর নগ্ন নয়, তবু সবই নিষ্ঠুর নগ্নতা ;
যেখানে জীবন এক অগ্নিকুণ্ড এবং যৌবন

সহজ রৌদের নিচে সোনা রুপো পিতলের অহংকার নয়,
অথচ প্রকৃত অর্থে একটি দিগন্ত যতোদূরে
তারই সহচররূপে এই সব শূন্য দৃশ্যাবলী
আমাদের আরো দূরে—প্রচ্ছন্ন আঁধারে নিয়ে যাবে।
অন্তত আমরা যেন অন্ধকার দেউলে বারেক
মাছির মতন উড়ে এই দেখি, সময় চলেছে
নদীর স্রোতের প্রায়, কিন্তু তার এপারে ওপারে
আর সব প্রস্তরেরই মতো স্থাণু, নিশ্চল, নীরব হ'য়ে আছে।
ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখিনি এমন দৃশ্য, যাকে
বলা যায় অবিস্মরণীয়, তবু এখনো সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ে
গণ্ড-রাঙা-করা সব মেলার পুতুল মনে পড়ে ;
তাদের স্তনের আভা, তাদের চোখের শিখা থেকে
আজো মাঝে-মাঝে এই দুপুরবেলার মুহূর্তেরা
পাখির ঝাঁকের মতো জনপ্রিয় হ'য়ে জেগে ওঠে।

জাগ্রত জীবনে আজ পুঞ্জ-পুঞ্জ শব্দের প্রবাহ
আমাদের আলোড়িত করে। আমাদের ক্ষমা ক'রে
যে-সব আলোর রেণু প্রতিদিন পতঙ্গের পাল
গ্রাস করে, অন্ধকারে এবং কুয়াশাকীর্ণ ভোরে
সেই সব নষ্ট পতঙ্গের মুখ, মৃত্যু ও জীবন
অজস্র রৌদ্রের দিকে উড়ে যেতে-যেতে ফের বলে,
ওরে প্রিয়, স্বপ্ন ছাখ, তোর জন্য ঐ দূরে জলে
আমাদের সম্মিলিত উদ্যমের অগ্নিকুণ্ড, ছাখ,
কেমন দুপুরবেলা খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়ে
আবৃত আলোর দিকে, অপরাহ্ণে, প্রেমিকের চোখে।

হে প্রেম, তোমার জন্য ঐ শোনো বাজে
আমাদের সম্মিলিত পাপে এক মন্দিরের মলিন পাষাণ ;
দর্পণে চাইনি ফিরে, তবু দুই চোখের উদ্ভাস
চেয়ে ছাখো, চিরকাল জেগে রয় তোমার শিয়রে ;
আগুনে ছিলাম, আজ আলোকের দিকে চ'লে যাই—
হে স্বপ্ন, মৃত্যুর ছায়া ; হে আঁধার, হে মহাজীবন।

স্মৃতির আলোয়

দুঃস্বপ্নে একটি সাপ প্রতিদিন আসে এইখানে :
আমার চোখের মাঝে, আমার বুকের মধ্যে তার
নিখুঁত ফণার মুদ্রা নিদ্রাতুর মুখের উপরে।
চতুর্দিক ভ'রে জ্বলে নীল আলো, জ্বলে
অনেক নক্ষত্র, চাঁদ, হিম-জমা প্রকাণ্ড পাহাড়,
আলোয় ছায়ায় মেশা দীর্ঘ, দীর্ঘ গাছ
জ্যোৎস্নায়, স্মৃতির মতো, বিস্মৃতির মতন এখানে ;
যেন এই পৃথিবীর নদী-সমুদ্রের সন্নিকটে
একটি নিভৃত দুঃখ দুঃস্বপ্নের ভিতরে দাঁড়িয়ে।

কুণ্ডলী-কাঁপানো এক শরীরের অতর্কিত আভা
ঘুমের ভিতর দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন নদীতে আমাকে
নিয়ে যায় ; আমি স্পষ্ট তার সেই মুখ
আমার মুখের কাছে, আমার বুকের কাছে এনে
নক্ষত্রকে নিভে যেতে বলি ; তার কানে-কানে বলি,
আঁধারের মতো কোনো অনুপম সত্যে উপনীত
হ'য়ে, অথবা না-হ'য়ে, এই প্রাণ

পুড়ুক যে-কোনো এক অগ্নিকুণ্ডে, যেখানে জীবন
জীবনের হত্যাকাণ্ডে হৃদয়ের গুণগান করে।
ঐ পোড়ো মাঠে এক বিনষ্ট হৃদয়,
অজস্র জোনাকি জ্বলে তাকে ঘিরে-ঘিরে,
ঘুরে-ঘুরে নেভে ক্রমে নাম, স্মৃতি আনন্দ ও আলো।

ক্রমশ সুনীল আলো ফিকে হ'য়ে এলো এইখানে ;
এখানেই আন্তরিক কোনো আলো অথবা আগুন
কিছুই জ্বলবে না আর বহুকাল ; অথচ অতীতে
একবার দরজা খুলে দিলে কতো রোদ
প'ড়ে থাকতো এই সব বিক্ষত পাষাণে ; সারাদিন
মনেও হ'তো না কেউ মৃত্যুরূপে জাগে অন্য ঘরে,
কিংবা কোনো জানালার রহস্যের আভা
আজো নড়ে-চড়ে এই বিকেলের পর্দার পিছনে।
এই সব ছায়াচ্ছন্ন অতীত হারিয়ে যাবে আজ ;
আজ শুধু মনে হবে, কী যে মনে হবে—হায়, স্মৃতি…
চতুর্দিক ভ'রে জ্বলে নীল আলো, জ্বলে
অনেক নক্ষত্র, চাঁদ, হিম-জমা প্রকাণ্ড পাহাড়,
আলোয় ছায়ায় মেশা দীর্ঘ, দীর্ঘ গাছ
জ্যোৎস্নায়, স্মৃতির মতো, বিস্মৃতির মতন এখানে।

দুঃস্বপ্ন ! একটি সাপ আজ আমায় করেছে দংশন।

বিপুল ধ্বংসের দিকে

বিপুল ধ্বংসের দিকে আছে এক আঁধার গহ্বর ;
জীবন, উপভোগের ফুল মাত্র, কাননের কীট, বুঝি তাও।
তবু সে চতুর উক্তি, দৃষ্টান্ত এবং উঁচু গলা,
কথনো এমন নয়, যার অর্থে সঞ্জীবিত সর্ব সারাৎসার,
নিষিদ্ধ সে-পথ নয় প্রকৃত উপমা, যার মূলে
একটি কেন্দ্রের মুখ, একাধিক আত্মসমর্পণ,
পাপ, ক্লান্তি, মৃত্যুভয়, নৈরাজ্য, বিষাদ সবই আছে ;
আছেন ঈশ্বর তাঁর একাকিত্বে, যেথানে নির্ঝর
প্রতিটি স্ফুলিঙ্গে পূর্ণ আগুনের ফুল নয়,
বরফের শীতলতা নয় ; তবু, তারই বিপরীত উপমান
প্রস্তরফলকরূপে বিজ্ঞাপিত যে-শূন্য মন্দিরে,
ছাথো তার তন্ময়তা শৃঙ্গের গোপন অহংকার।

আলো, আরো আলো চাই চিন্ময় পাষাণে।
প্রতিটি সোপানশ্রেণী চিরকাল আঁধারে আবৃত ;
দেবদারু-বৃক্ষঘন পথে যেতে-যেতে কোনোদিন
বৃষ্টি হবে, এই আশা ; অথবা লোকালয়ের বুকে
রৌদ্রে চমৎকৃত হবে সেই স্বপ্ন, যার শবদেহ
অস্ত্রোপচারের আগে ছিলো অস্থিমাংসের বিপণি।
এখন উন্মুক্ত সবই, যেদিকেই দৃষ্টি ফেরে, দেখবে দৃশ্যাবলী
নিদ্রিত, অথবা অবচেতনের অন্যায় সুযোগে
তোমাকে আকৃষ্ট করে তরঙ্গের বিবিধ মুদ্রায়।
তোমার তৃষিত জিহ্বা লেহনের জন্য ব্যবহৃত,—

এই সত্য সংশয়ের অতীত উদ্যানে, গাছপালায়
প্রচারিত, দ্বিরাচার একাত্মীকরণে উন্মোচিত।

একাগ্র লক্ষ্যের দিকে এখনো আঁধারপুঞ্জ জলে,
এখনো যে-সব মুখ মৃত ব'লে, এ-বিশ্বভুবন
দেখায় দর্পণধৃত অজস্র জীবন, সকলেই জানি,
আমাদের আত্মীয়তা তাদের শরীর নিয়ে ছিলো একদিন।
খণ্ড-খণ্ড পাথরের উপরে এখন অন্য আলো,
জলাশয়ে কী নিবিড় জ্যোৎস্না ভাসমান ;
এই তো সময় যদি মৃত্যুরূপে সোনার হরিণ
আমাদের ডেকে নেয় অরণ্যের ইচ্ছার ভিতরে,
আমরা সবাই নেবো সেই মৃত্যুবরণের পূর্ণ অধিকার।
নগ্নতাই শেষ সত্য, যেহেতু সে—রাত্রির আগুন,
আমাদের শারীরিক উত্তাপে, তৃষ্ণায় সম্মিলিত ;
এবং অপাপবিদ্ধ অঙ্গ জুড়ে দিগ্বিজয়ী তারই সমারোহ।

বিপুল ধ্বংসের দিকে, দিগন্তের দিকে চলে যাই।

চারটি কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'O my luve's like a red, red rose !'

একটি ভীরু গোলাপ কেঁপে ওঠে
ভিজে রোদের শেষ রঙিন শিখায় :
রক্ত বুঝি ছিটিয়ে দিলে কেউ ;
ধূসর ছাই হাওয়ায় লুটোপুটি।

নিস্বনিত বিদ্যুতের রেখা
আকাশ ছিঁড়ে, তোলে অবুঝ ঢেউ—
রুপোর ঘাস কাঁপায় থরোথরো।

প্রবল, শাদা, তৃষ্ণা দিয়ে গড়া
দেয়াল ভেঙে ছিটিয়ে দেবে তারা—
এই পণেই ছদ্মবেশী সিঁড়ি
পেরিয়ে আসে মত্ত বাতাসেরা ;
কপাল ঠোকে বেতাল চীৎকারে
ভুল ঘরের পরদা-ঢাকা দ্বারে।

রানীর মত গোলাপ কেঁপে ওঠে ॥

তাহ'লে, দয়ার ছলে

সব-কিছু কেড়ে নিলো—অন্ধকার, ক্লান্ত অবসর,
গোলাপ, গানের সুর, বিস্মৃতির কবচকুণ্ডল।
তীক্ষ্ণ দাঁত কেটে বসে। বাচাল সমুদ্র উতরোল

যখন, ক্ষুধায় জ্ব'লে, রাশি-রাশি হাঙর মকর
ডুবে-যাওয়া নাবিকেরে ছিঁড়ে ফ্যালে প্রাচীন পুলকে।
তাহ'লে, দয়ার ছলে, শুধু এই নির্বাসন দিলে
যেখানে গোপন ঘরে, দিগন্তের দীপ নিবে গেলে
তৃষ্ণার প্রবল তাপে ঘুম জ্বলে লবণ গন্ধকে।

এ-কথা সবাই বলে, সার সত্য রূপান্তরণ।
কেননা অস্থির দিন, দূর মেঘ, হাওয়া নিরবধি
জোয়ার জাগিয়ে রাখে, চ'লে গেলে কখনো ফেরে না।
প্রতীক্ষা নিরন্ত তবু ; প্রতিধ্বনি করে না করুণা :
লৌকিক যুক্তির জাল অকস্মাৎ ছিঁড়ে ফেলে যদি
সমস্ত ভুবন জুড়ে বেজে ওঠে গাঢ় টেলিফোন ॥

আদি দ্বন্দ্ব

নকল দেয়ালগুলি ভেঙে পড়ে, মাটি সরে পায়ের তলায়,
কোনো কিছু ছিলো না নিজের ব'লে ; বাঙ্ময় শিখায়
যে-প্রদীপ জ্বলেছিলো, তাও নয়। আর তাই ফুরোনো তুফানে
কাঁপে সে বারংবার, বাসনার গূঢ় অন্তঃসার
জ্বালায়, উন্মুন যেন ; উন্মাদক ছন্দের নিস্বনে
স্পন্দন, রক্তের দোলা, ইন্দ্রিয়ের প্রার্থিত আঁধার
সনাতন প্রক্রিয়ায় বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শের মন্থনে
ফিরে-ফিরে সাধে তারে, কোনোদিন অকূল পাথার
আলো হ'য়ে ওঠে যার পরিশ্রমী প্রবালের লালে।

অনেকে এতেই ভোলে। নিরুপায়, সে আরো, আড়ালে :
কারণ, ছায়ার তলে, কুটিল, গোপন, অলৌকিক

স্মৃতির হলুদ দাঁত ছেঁড়ে, চেরে নির্জীব বিকল
আশা, ভাষা, তৃষ্ণাকে। শুধু তাই এ-দ্বন্দ্ব মৌলিক,
আলো-হ'য়ে-বেজে-ওঠা দেবতার মতো অবিচল ॥

সারা রাত তুমি

সারা রাত তুমি জানালায় টোকা দিলে,
কেঁপে-কেঁপে গেলো বোকা ছিটকিনিগুলি—
বৃষ্টি নামবে এখনি সংগোপনে!
—একদিন তুমি সব-কিছু নিয়েছিলে।

গোলাপ? তাকেও তুমি নিয়েছিলে তুলে।
পুনর্জাগর রাত্রির ভাঁজ খুলে
গন্ধ ছিটিয়ে মর্মরে, নিস্বনে
তাই বাজে হাওয়া, কাঁটা, ক্ষুধা, ডালপালা।

চড়ুয়ের মতো ব্যস্ত, ঝাপসা হাওয়া
পরদা কাঁপায়, বাগান দুলিয়ে দিয়ে
বৃষ্টি ছিটোয় লাজুক অন্ধকারে।
বেদের বাঁশির সুরে শিউরোয় ছায়া,
স্মৃতি জেগে ওঠে গন্ধের বিস্ময়ে,
বাঁধ ভেঙে গেলো বন্যার তোলপাড়ে,
জ্ব'লে ওঠে শিখা : মত্ত লাল গোলাপ ॥

পুর্ণিমা

নবনীতা দেব

দেখেছি গঙ্গায় আমি ব্যর্থ এক চাঁদ ডুবে যেতে।
যদিও বজরা ভ'রে প্রেমিকের কল্লোল স্বনিত,
তারাদের নাভিশ্বাস, সকালের আলোর গুঞ্জন,
সব ধ্বনি গ্রাস ক'রে চাঁদ শুধু শব্দময় হ'লো।

সারা রাত্রি সারা রাত আকাশের বিলোল প্রাসাদে
স্বপ্নচারী শুভ্র চাঁদ সময়ের সংগীত শুনেছে;
তারপর তমোহীন স্বপ্নহীন পরিচ্ছন্ন ভোরে
অকস্মাৎ আত্মদ্রষ্টা বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীর মতো
অনুদ্বিগ্ন পূর্ণচাঁদ শূন্য হাতে নেমে গেলো জলে।

শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা।' কথাগুলো লিখেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে কোনো পুস্তকপীড়িত প্রৌঢ় পণ্ডিত নন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরে এক অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁরই অব্যবহিত পরবর্তী এক কবি, তাঁর প্রথম সন্তানগণের অন্যতম। আর যেহেতু একজন কবির বিষয়ে অন্য এক কবির মন্তব্য, অত্যুক্তি হ'লেও, ভ্রান্ত হ'লেও, মূল্যবান (কেননা কেবল কবিরাই পারেন সংক্রামকভাবে সাড়া দিতে), তাই আমি এই চিরচেনা উদ্ধৃতি দিয়েই আমার এই বহুবিলম্বিত প্রবন্ধ আরম্ভ করছি। যে-পত্রে এই কথাগুলি গ্রথিত আছে তা ছত্রে-ছত্রে বোদলেয়ারে ভারাক্রান্ত ; দু-দিন আগে অন্য এক ব্যক্তিকে লেখা দোসর-পত্রটিও তা-ই ; আমরা অনুভব করি যে বোদলেয়ারের চিন্ময় সত্তা, হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার মতো, ব'য়ে চলেছে এই যৌবনকুঞ্জের উপর দিয়ে—কুঁড়ি ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, ফুল ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, মরা পাতার মতো মরা ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে কয়েকটি অকালপক্ক রক্তিম ফল ফলিয়ে তুলছে। 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে,' 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়,' 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ,' 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ ক'রে নিতে হবে,' 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হ'তে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি ক'রে অজানায় পৌঁছনো!'—আবার বোদলেয়ারীয় জগতে প্রবেশ করছি আমরা, পান করছি 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর সারাৎসার ; আমাদের মনে প'ড়ে যাচ্ছে 'প্রতিসাম্য', 'ভ্রমণ' ও 'সিথেরায় যাত্রা', মদ ও মৃত্যুর কবিতাগুচ্ছ ; প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গদ্যকবিতা ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র সেই সব অংশ (আর কোন অংশই বা তেমন নয়), যেখানে কবি সাহস করেছিলেন আপন আত্মার অনাবরণ উন্মোচনে। আত্মসন্ধান, আত্মপরীক্ষা ; দুঃখ, রোগ, মত্ততা ; ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময় : সূত্রগুলি সবই বোদলেয়ারের, কিন্তু কণ্ঠস্বর

নতুন, বাচনভঙ্গি নতুন ; তাঁর 'শৌখিনতা' বা কৌলীন্য বা ক্লাসিক শিল্পচেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সদ্য-জেগে-ওঠা সহজ আত্মচেতনা, যার তীব্র চাপে সারা অতীত, রাসীন ও ভিক্তর উগো সুদ্ধ, বন্যার মুখে মস্ত বুড়ো গাছের মতো ধ্ব'সে পড়ছে।

তখন ১৮৭১ ; ছয় বছর আগে, যখন পর্যন্ত বোদলেয়ার অন্তত শারীরিক অর্থে জীবিত, তেইশ বছরের যুবক মালার্মে একটি গদ্যকবিতায় প্রথম প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর গুরুকে, আর প্রায় সমবয়সী ভেরলেন ঘোষণা করেছেন যে 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর রচনারীতি 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন'। যে-খ্যাতিকে, আঁদ্রে জীদের ভাষায়, তাঁর জীবৎকাল এক পবিত্র স্তব্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো, তার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ভাবীকাল ছিনিয়ে নিয়েছে সেই নামটিকে, সহজীবীরা যার বানান পর্যন্ত নির্ভুল লেখার প্রয়োজন দ্যাখেননি। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করলেন জে.-কে. উইসর্মাঁ, ল্যামেৎর, লাফর্গ ; আর লণ্ডনে, রাইমার্স ক্লাবের পত্তনের সময়, ইয়েটস অনুভব করলেন যে, বোদলেয়ার ও ভেরলেনের অনুসরণে, 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে মুক্তি দিতে হবে কবিতাকে।' ইয়েটস ফরাশি জানতেন না ; তাঁকে আর্থার সাইমন্স প'ড়ে শোনাতেন ফরাশি কবিতা, আর তার স্বকৃত অনুবাদ ; আর এমনি ক'রেই, বোদলেয়ারের প্রবর্তিত ধারা থেকে, ইয়েটস তাঁর নিজের কবিতার পক্ষে জরুরি দু-একটা ব্যাপার শিখে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের অভিঘাতে ইংলণ্ডে আরো প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিলো, সেই 'নব্বুই'-যুগের পীতাভ পাংশুতা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু সেই ব্যর্থতাও অন্ততপক্ষে নতুন একটি চেতনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা সেটাই সেই সময়, যখন ইংরেজি ভাষার কোনো-কোনো লেখকের মনে প্রথম এই সত্যটি প্রথম উঁকি দেয় যে টেনিসন থেকে স্যুইনবার্ন পর্যন্ত কবিরা শুধু রোমান্টিকদের চর্বিতচর্বণ ক'রে গেছেন, যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ও সপ্রাণ কবিতার জন্য তাকাতে হবে সেই দেশের দিকে, যে-দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবের পারম্পর্যে ক্ষতবিক্ষত এবং ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায়

বহু দূরে পেছিয়ে-থাকা। এ-কথাও স্মর্তব্য যে বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে, যখন পর্যন্ত তিমিরলিপ্ত ইংলণ্ডের তটে দুই মার্কিন ত্রাতা এসে পৌছননি, তখনই ইয়েটস ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কবিতা সম্ভব ক'রে তুলছেন; আর প্রায় একই সময়ে এক কৃশতনু জর্মান ভাষার কবি প্যারিসে ব'সে রচনা করছেন 'মালটে লাউরিডজ ব্রিগ্‌গে' নামক গদ্যগ্রন্থ, যার কোনো-কোনো অংশ বোদলেয়ারের স্তবগান। আর তারপর থেকে পশ্চিমী কবিতায় এমন কিছু ঘটেনি, সত্যি যাতে এসে যায় এমন কিছু ঘটেনি, যার মধ্যে, কোনো-না-কোনো স্তরে বা সূত্রে, বোদলেয়ারের সংক্রাম আমরা দেখতে না পাই। আজকের দিনে কারোরই জানতে বাকি নেই যে তিনি শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা। অনুভব না-ক'রে উপায় নেই পরবর্তী ফরাশি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা দূরাগত, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে-আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্তনির্যাস। এবং শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে; তাঁর কবিতাকে ছবির ভাষায় সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন রদাঁ, ক্লয়ো ও মাতিসের মতো শিল্পীরা; এবং রদাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে-ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি তিনি, এত বড়ো বৈদেশিক বিস্তার তাঁর আগে অন্য কোনো ফরাশি কবির ঘটেনি। বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর, সাহিত্যিকেরা বংশপরম্পরায় তা ক'রে গেছেন, ইংরেজিতে এক-একটি কবিতার শতাধিক অনুবাদ পর্যন্ত হয়েছে। এই বাংলাদেশেও কোনো-এক লেখক, পঞ্চাশের প্রান্তে এসে, আয়ু ও স্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা জেনেও, তাঁর কবিতার অনুবাদে অনেক ঘণ্টা, সপ্তাহ ও মাস সানন্দে নিবেদন ক'রে দিলেন। আজ, তাঁর জগৎ-জোড়া প্রতিপত্তির দিনে, এই কথাটা মেনে নেয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হ'য়ে গেছে যে তিনি 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা।'

২

কিন্তু 'প্রথম' কেন? 'দ্রষ্টা'—সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা; আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হ'তে পারেন? পারেন না তা নয়; অনেকে, শুধু রচনার নৈপুণ্যের বলে, কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন: ঈশপের ছন্দোবদ্ধ প্রকরণ লিখে লা ফঁতেন, সুবুদ্ধিকে আঁটো দ্বিপদীর চুড়িদার পরিয়ে আলেকজাণ্ডার পোপ। ঐতিহাসিকেরা, সরকারি সমালোচকেরা, এঁদেরও কবি ব'লে মানতে বাধ্য; কিন্তু যাঁরা নিজেরা দ্রষ্টা, অন্তত কবিতার বিষয়ে দ্রষ্টা, তাঁরা, র‍্যাঁবোর মতোই, এঁদের 'সমিল-পদ্যলেখক' বলেই জানেন। যাকে বলা হয় 'আলোকপ্রাপ্তি', সেই প্রায় অমানুষিক যুক্তিবাদের গুমোট ভেঙে যখন রোমান্টিকতার ঝড় উঠলো, তখনও, হৃদয়ের স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও, কবিতা ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারলে না, তার দেহে লগ্ন হ'য়ে রইলো আঠারো শতকের অনেক উচ্ছিষ্ট: জ্ঞানের ভার, উপদেশের ভার, হিতৈষণার জঞ্জাল। প্রভেদ এই যে 'আলোকপ্রাপ্ত' কবিরা মাষ্টারি ধরনেই মাষ্টারি করতেন, তাঁদের কবিতা ছিলো শিক্ষিত সালঁর সংলাপ, শ্রোতাদের বিষয়ে সচেতন; আর রোমান্টিকেরা উপদেশ দিতেন মন্ময় ভঙ্গিতে, প্রবক্তার ধরনে, আর তাঁদের কবিতা ছিলো রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি। কবিতাকে এবার স্বগতোক্তি হ'তে হবে—সামাজিক আলাপ আর নয়—এই সত্যটি তাঁরা বুঝেছিলেন, কিন্তু 'স্ব' বলতে ঠিক কী বোঝায় তার ধারণায় ভ্রান্তি ছিলো তাঁদের। বলা যেতে পারে যে অকবি ও কবির মধ্যে যা তফাৎ, সেই তফাৎই পোপের সঙ্গে শেলির, এবং লা ফঁতেনের সঙ্গে ভিক্তর উগোর; আমরা মানতে বাধ্য যে রোমান্টিকেরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, তাঁরাও চেয়েছেন অদৃশ্যকে দেখতে এবং অশ্রুতকে শুনতে; কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধানকর্তা', আর কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই, যা কবিতা নয় এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হ'তে পারেনি। জগৎটাকে বদলানো যে কবির কাজ নয়, এই ধারণা গোতিয়ে-র ছিলো, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা মনোমুগ্ধকর

পন্থের শুর ছাড়িয়ে বেশি উপরে উঠতে পারেনি ব'লে, তাঁকেও পরিহার না-ক'রে তরুণ র‍্যাঁবোর উপায় ছিলো না। উপায় ছিলো না, উগোর উচ্ছ্বাস, লেকঁৎ দ্য লিল্-এর কারুকার্য ও গোতিয়ের এলাচগন্ধী সন্দেশের মতো উপভোগ্যতার পর, 'ফ্লার দ্যু মাল'-এর কবিকে প্রথম দ্রষ্টা ব'লে ঘোষণা না-ক'রে। র‍্যাঁবো যা বলতে চেয়েছিলেন (প্রায় তাঁর নিজেরই ভাষায় বলছি) তা এই যে রোমান্টিকেরা যা জানতেন না তা বোদলেয়ার জেনেছিলেন—যে কবি বক্তা অথবা প্রবক্তা নন, দ্রষ্টা, অর্থাৎ বিশ্বজগতে লুক্কায়িত সম্বন্ধসমূহের আবিষ্কারক, যে তাঁর স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করাই তাঁর স্বধর্ম। 'বাগ্মিতার শিরশ্ছেদ করো,' 'আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা'—ভেরলেন ও মালার্মের পক্ষে এ-রকম কথা বলা সম্ভব হ'তো না যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন।

রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। 'রোমান্টিক' বলতে আমি বুঝি—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, বা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয়—শুধু ইস্তি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি, যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি কিন্তু কোনো-কোনো যুগে—যেমন শেক্সপীয়রের ইংলণ্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুসোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হ'য়ে উঠলো। আরম্ভ হ'লো ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যের বিরাট এক ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে-পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা

ভালেরীর মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষাব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্যায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমাংশে রোমান্টিকতার চেহারা ছিলো বন্যার মতো; যেমন তা অনেক বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলো তেমনি টেনে তুলেছিলো বহু আবর্জনা; মুছে দিয়েছিলো, উৎসাহের প্রথম নেশায়, অনেক প্রয়োজনীয় ভেদজ্ঞান, যাকে ভেরলেন বলেছিলেন 'নেহাৎ সাহিত্য', তার সঙ্গে কবিতার পার্থক্যটিকে স্পষ্ট হ'তে দেয়নি। বাকি ছিলো বোদলেয়ারের জন্য এই কাজ—রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন; তার সব অবান্তরতা বর্জন ক'রে কবিতাকেই সর্বস্ব ক'রে তুললেন—তিনিই প্রথম। রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমণ্ডিত রচনা, যার কোনো-কোনো পংক্তি বা অংশ কবিতা হ'লেও, অনেক অংশই কবিতা নয়; কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পংক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ক ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত। তাই 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্লার দ্যু মাল', আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭।

আমি ভুলিনি যে পূর্ববর্তী অনেক কবিতে আধুনিকতার পূর্বাভাস আছে, তার কোনো-কোনো লক্ষণে তাঁরা সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডে ব্লেক, কীটস, কোলরিজ; জর্মানিতে নোভালিস ও হোল্ডার্লিন; ফ্রান্সে নেরভাল ও গোতিয়ে, আমেরিকায় পো এবং হুইটম্যান—এঁদের আদর্শ বা পরামর্শকে, কোনো-না-কোনো দিক থেকে, আধুনিক কবিতার প্রকরণে অথবা মর্মস্থলে ফলপ্রসূ হ'তে দেখেছি আমরা। কিন্তু এঁদের পাশে বোদলেয়ারকে যদি রাখি, আর বোদলেয়ারের কবিতার পাশে তাঁর শিল্প-সমালোচনাকে, তাহ'লে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিচ্ছিন্ন ও কিছুটা আকস্মিকভাবে, কবিতার যে-সব নতুন সূত্র এঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলিকে যেন এক আশ্চর্য শুভক্ষণে, বোদলেয়ার বেঁধে দিলেন এক অনন্য গুচ্ছে, এমনভাবে সমন্বিত ক'রে দিলেন যাতে তা ভাবীকালের ব্যবহারযোগ্য হ'য়ে উঠলো। এঁরা কী করছেন, এঁদের কৃতির ফলাফল

বা দ্যোতনা কী, সে-বিষয়ে এঁদের চেতনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ক্ষীণ অথবা খণ্ডিত; কিন্তু বোদলেয়ারের চৈতন্য তাঁর নিজের বিষয়ে ও কবিতার বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর। কোলরিজ কবিতাকে ত্যাগ করলেন, ব্লেক চাইলেন নতুন ধর্মের প্রবর্তক হ'তে, হুইটম্যান নিজেকে ধ'রে নিলেন বিশ্বমৈত্রীর দূতপ্রধান; অগ্রজদের মধ্যে একমাত্র যিনি সন্দেহ করেছিলেন—যদিও কাজে তা ক'রে উঠতে পারেননি—যে সবচেয়ে জরুরি কথা হ'লো কবিতাকে নতুন ক'রে তোলা, তিনি অ্যালান পো। আমরা জানি এই মার্কিন কবির বিষয়ে বোদলেয়ারের উৎসাহ ছিলো সীমাহীন, এবং পূর্বোল্লিখিত কবিদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী তাঁদের আর কারো সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিলো কিনা, তা আমরা জানি না। ব্লেক অথবা কোলরিজকে জানলে, মনে হ'তে পারে, তিনি পো-র দ্বারা অত দূর পর্যন্ত মুগ্ধ হতেন না; এবং এমন মতও আমরা শুনেছি যে এই মুগ্ধতার গূঢ় কারণ তাঁর (ও পরে মালার্মের) ইংরেজি ভাষায় যথোচিত জ্ঞানের অভাব। সত্য, বোদলেয়ার পো-র রচনায় অংশত এমন কিছু পড়েছিলেন যা তাতে নেই; কিন্তু তার জন্য দায়ী কি ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনভিজ্ঞতা, না কি তাঁর স্পর্শময় কবি-মন, যা অন্য এক সবর্ণ কবিকে নিজের মধ্যে শোষণ ক'রে নিতে উৎসুক? ভাষা এক হ'লেও, একজন কবি অন্য এক কবিকে দিয়ে নিজের কথাই বলিয়ে নিতে চান, ভাবনার কোনো স্তরে মিল দেখলে—বৈসাদৃশ্যগুলি ভুলে গিয়ে—তাঁকে কল্পনা ক'রে নেন নিজেরই বিকল্প ব'লে। আর পো-র বিষয়ে তা-ই করেছিলেন বোদলেয়ার। পো-র মধ্যে তিনি দেখেছিলেন 'সেই আধুনিক কবিকে, যিনি সর্বমানবের হ'য়ে দুঃখ পান'; অর্থাৎ, পো-র মধ্যে নিজেকেই দেখেছিলেন। স্মর্তব্য, তাঁর মনে প্রথম প্রবল নাড়া দিয়েছিলো অ্যালান পো-র দুঃখময় জীবন, আর তিনি অনুবাদ করেছিলেন প্রধানত পো-র গল্পকাহিনী, যার রহস্যময় ইন্দ্রিয়বিলাসে বোদলেয়ারের একাত্মবোধ অনিবার্য ছিলো। কবি হিশেবে দু-জনের মধ্যে তুলনার প্রস্তাব হাস্যকর; অনর্থক, বোদলেয়ারের কবিতায়

পো-র 'প্রভাব' সন্ধান করা*, কেননা পো-র সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তিনি অধিকাংশ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' রচনা শেষ করেছিলেন। 'কবিতার মূলসূত্র' প্রবন্ধে পো দু-একটি অভিনব ও আমাদের পক্ষে আদরণীয় কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাতেও এমন কিছু নেই যা বোদলেয়ার স্বাধীনভাবে নিজেই আবিষ্কার করেননি। কবিতা দীর্ঘ হ'লে যে আর কবিতা থাকে না—যে-কথা কোলরিজও প্রকারান্তরে বলেছিলেন—তা বোঝার জন্য পো-পঠনের প্রয়োজন ছিলো না তাঁর; 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

কাব্যকলায় বোদলেয়ারের মহৎ কীর্তি এই যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত ক'রে দেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে প'ড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারণা দুটি অমোঘভাবে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি তাঁর—এই সবই নির্ভুলভাবে ক্লাসিক লক্ষণ, কিন্তু এই কঠিন রূপকল্পের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন এক দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্যকে—যা রোমান্টিকতার সারাৎসার। আছেন রোমান্টিক ও ক্লাসিক গ্যেটে, রোমান্টিক ও ক্লাসিক রবীন্দ্রনাথ; দুয়ের পার্থক্য—অন্তত অস্পষ্টভাবে—আমরা অনুভব করতে পারি; এঁদের প্রত্যেক রচনায় সম্পূর্ণভাবে কবিদের পাই না। কিন্তু বোদলেয়ারের প্রায় প্রতিটি কবিতা—এবং অনেক গদ্যরচনাও—তাঁর পূর্ণ সত্তাকে ধারণ ক'রে আছে, আর সেইজন্যই তারা এমন প্রাণতপ্ত ও স্পন্দনময়;

* প্রসঙ্গত উল্লেখ না-ক'রে পারছি না যে অ্যালান পো-র কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছেন একজন আধুনিক বাঙালি কবি: 'বনলতা সেন' ও 'Helen, thy beauty is to me' এ-দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ। 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ', এ-সবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র, কিন্তু, যেমন 'হায়, চিল' কবিতায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গেছেন। জীবনানন্দর প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়), এবং দ্বিতীয় ও আরো বড়ো জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পংক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পো-র শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।

যিনি প্রথম বার 'ফ্লার দ্যু মাল' পড়ছেন তিনি প্রায় যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলেই উত্তীর্ণ হবেন এক অজ্ঞাতপূর্ব, রোমাঞ্চকর যাত্রাপথে। 'আমি বেরিয়েছি অসীমের সন্ধানে—একা আমি, গুরু নেই, নেই কাণ্ডারী বা উপদেষ্টা, পাল পর্যন্ত নেই আমার তরীতে'—এই হ'লো রোমান্টিকতার মর্মকথা; কিন্তু এর উচ্চারণ 'ফ্লার দ্যু মাল'-এ যেমন শুদ্ধ, সংহত ও নির্ভীক, পূর্ববর্তী চিহ্নিত রোমান্টিকদের মধ্যে একজনেরও সে-রকম নয়।

অথচ, নানা দিক থেকে, রোমান্টিকদের সঙ্গে দুস্তর তাঁর ব্যবধান। রোমান্টিকেরা ভালোবেসেছেন গ্রাম ও গ্রাম্যতাকে; তাঁর ছন্দে প্রথম ধরা পড়লো, সব ক্লেদ ও সন্তাপ নিয়ে, আধুনিক নগরজীবনের চঞ্চলতা। প্রকৃতির, নগ্নতার, স্বাভাবিকের পূজক ছিলেন রোমান্টিকেরা, আর বোদলেয়ার বন্দনা করেছেন প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের, অর্থাৎ শিল্পের, অর্থাৎ চেতনার—তাঁর বিখ্যাত ড্যাণ্ডীজম-এর অর্থই এই। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেন, 'পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ', সেখানে তরুণ বোদলেয়ারের নায়ক, বহু-বাঞ্ছিতা প্রণয়িণীকে প্রথম বার বিবসনা দেখে, সরোষে প্রতিবাদ করে। রোমান্টিকেরা স্বাভাবিককেই সুন্দর ব'লে—এমনকি ভালো ব'লে—জেনেছেন, কিন্তু বোদলেয়ারের কাছে তা-ই শুধু শ্রদ্ধেয়, যা রচিত, চৈতন্যের দ্বারা শোধিত, চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা প্রাপণীয়। যে-কামরূপ নারীকে ভিক্তর উগো মহিমান্বিত করেছেন 'স্বর্গীয় ভাস্করের আঙুলে গড়া আদর্শ কর্দম' ব'লে, তাকে বোদলেয়ার বলেছেন 'প্রোজ্জ্বল ক্লেদ', 'স্বা ভা বি ক ব'লেই ঘৃণ্য'। 'নারী চায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল; যৌন কামনার তৃপ্তি—অতএব সে ড্যাণ্ডীর ঠিক বিপরীত'—তাঁর এই বাক্যটি আঠারো-শতকী যুক্তিবাদের যেমন বিরোধী, তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদেরও তেমনি প্রতিকূল। দুই যুগেরই উপাস্য ছিলো প্রকৃতি; কিন্তু যুক্তিবাদীরা প্রকৃতি বলতে বুঝতেন স্বভাবী ও সংগতকে, আর রোমান্টিকেরা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তকে। আর উদ্ধৃত উক্তিটির অর্থ এই যে মানুষের মধ্যে সেই অংশই তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, যা স্বভাবের বিরোধী। যে-ভাষা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সংবাদজ্ঞাপনের নির্বিশেষ বাহনমাত্র, কেউ-কেউ,

স্বভাবের বিরোধিতা করে, তাকে রূপান্তরিত করেন ছন্দোবদ্ধ ও চরিত্রবান কবিতায়। যে-সব প্রাকৃত ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন অধিকাংশ মানুষের নিত্যকর্ম, কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে উপবাসী থাকেন বা ব্রহ্মচারী হন। শুধু কবিতা বা সন্ন্যাসই নয়; প্রকৃত পাপও চৈতন্যের ফল; তাই পাপকে বোদলেয়ার—ক্ষমা করেননি, কিন্তু শ্রদ্ধা করেছেন; তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো, হুইটম্যানের মতো, পাপবোধহীন পশুদের প্রতি অনুরাগ। তাঁর কাব্যে নারী যেমন জৈবতার, পশু তেমনি মনোহীনতার প্রতীক; একমাত্র যে-পশুকে তিনি ভালোবেসেছিলেন সে গৃহপালিত মার্জার, যার দৃষ্টির বহুলাঙ্গ দ্যুতিকে প্রায় একটি শিল্পকর্ম ব'লে ভুল হ'তে পারে। রোমান্টিক গোটের সব-পেয়েছির দেশ সেখানে, যেখানে নীলিমার নিচে, কালো পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে, জলজল করে সোনালি রঙের কমলালেবু; রবীন্দ্রনাথের, যেখানে প্রণয়ীযুগল আধো-আলোয় ঘুরে বেড়ায় আর 'পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা'; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে যেতে চান এক দর্পণশোভিত সুপ্রসাধিত ওলন্দাজ অন্তঃপুরে, যার জানলা দিয়ে দেখা যাবে—প্রকৃতির দান তরুপল্লব নয়, বুদ্ধির সৃষ্টি অর্ণবপোত। ওঅর্ডস্বার্থ ভজনা করেছেন 'মূক ও নিশ্চেতন বস্তু'কে, রবীন্দ্রনাথ গাছ হ'য়ে জন্মাতে চেয়েছেন; আর বোদলেয়ার ইচ্ছা করেছেন সব উদ্ভিদের উচ্ছেদ, শিল্পিত ধাতু ও প্রস্তরময় এক প্যারিস। একটি পাখির পালক বা ফুলের পাপড়িকে রোমান্টিকরা যেমন ক'রে বর্ণনা করেন, তেমনি সপ্রেম মনোযোগ বোদলেয়ার অর্পণ করেন আসবাবপত্রে ও নারীর বেশবাসে; পর্দার বর্ণ ও ঘনতা, রেশম ও সাটিনের স্পর্শ, ধাতুর দীপ্তি, রত্নের রশ্মিময়তা—প্রথম তাঁর কাব্যেই মানুষের আত্মা এ-সবের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের ধারণাকে মূর্ত করেছিলেন উর্বশীতে, যার নাচের ছন্দে পুরুষের রক্ত 'আত্মহারা' হ'য়ে সাড়া দেয়, আর বোদলেয়ারের সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্ফিংক্সের মতো স্থির ও দুর্বোধ, যে বলে: 'পাছে রেখা স্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা', আর যাকে দেখে কবিরা উদ্বুদ্ধ হন, রতিবিলাসে নয়, 'পাঠে ও কঠিন

চিন্তায়'। 'ইন্দ্রিয়ে যখন আগুন ধরে তখন সৌন্দর্যকে বাহুবন্ধে বেঁধে ভগবানকেই আলিঙ্গন করি আমরা'—এই হ'লো যৌন বৃত্তি বিষয়ে উগোর ধারণা; কিন্তু বোদলেয়ার বলেন যে 'পাপকর্মের চৈতন্যই মহত্তম রতিসুখসার'। আর সর্বোপরি, রোমান্টিকেরা যেখানে কবিকে ভেবেছিলেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম স্থপতি ব'লে, সেখানে বোদলেয়ার কবিকে বললেন পরম ভ্যাণ্ডী, যে দর্পণের সামনে দিনযাপন করে ও নিদ্রা যায়। দর্পণের সামনে: তার মানে, আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষাই কবিকৃত্য; কবির চৈতন্য এমন ক্ষমাহীন যে ঘুমিয়েও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না। যে-মধ্য-উনিশ শতক ইংলণ্ডে উপযোগবাদে ধূসর, সেই সময়ে বোদলেয়ার ঘোষণা করেন যে কবি কোনো 'কাজে লাগেন' না, যে বায়রনি বিদ্রোহের দিন গত হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ; প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস-স্প্লীন' ভ'রে তাদেরই দেখা পাই আমরা, যারা নির্বাসিত ও নির্যাতিত: বন্দী পশু, বৃদ্ধ ক্লাউন, উন্মাদ নারী, ভিনদেশী বেশ্যা, রোগী, মাতাল ও নাস্তিমানেরা—আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে এদের সকলের সঙ্গেই কবির একাত্মবোধ নিবিড়, এবং এরা, এদের বাস্তব আয়তন অক্ষুণ্ণ রেখেও, 'কবি' নামক ধারণাটিরই চিত্রকল্পের কাজ করছে। কবির বিষয়ে যে-বিশেষণটি বোদলেয়ার বার-বার ব্যবহার করেছেন তা 'পুণ্যবান' (pious); কিন্তু তাঁর পুণ্য তাঁর কর্মে নয়, চৈতন্যে; সেই বিবেকময়, চৈতন্যময় পুরুষ তিনি, যিনি, ডস্টয়েভস্কির প্রিন্স মিশকিনের মতো, জাগতিক ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম, অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকেও তিলতম পরিবর্তন যিনি আনতে পারেন না, অথচ নিজের মধ্যে নিখিলবেদনাকে ধারণ করেন। তাঁর কাজ জগৎকে বদলানো নয়, জগৎকে অনুভব করা। এবং সেই জ্ঞানের ও অনুভূতির শক্তিতেই তাঁর মহিমা।*

* এই অনুচ্ছেদে আমি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নাম করেছি, কেননা যদিও তিনি বোদলেয়ারের চল্লিশ বছর পরে জন্মেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক স্থান ওঅর্ডস্বার্থ, উগো, শেলি প্রভৃতি য়োরোপীয় প্রথম-রোমান্টিকদেরই সঙ্গে।

শুধু রোমান্টিক ও ক্লাসিকের ধারণাকে নয়, আরো কোনো-কোনো বিপরীতকে তিনি মিলিয়েছিলেন: কঠিন ছন্দোবন্ধনের সঙ্গে ভাষার নির্ভার মৌখিকতা, এবং মৌখিকতার সঙ্গে অভিজাত শুদ্ধতাবোধ—যাকে লাফর্গ আখ্যাত করেন একাধারে 'ইয়াঙ্কি' ও 'হিন্দু' ব'লে। মিল ও স্তবকবিন্যাসের নৈপুণ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকদের সমকক্ষ; কিন্তু আপন ক্ষমতায় মোহিত হ'য়ে স্তবকসংখ্যা তিনি এমনভাবে বাড়িয়ে চলেন না যাতে রচনার আয়তন বৃদ্ধি পেলেও, কবিতার ক্ষতি হয়। তাঁর রচনায়, উগো বা রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রূপকরণের বৈচিত্র্য কম, আর এতেও বোঝা যায় তাঁর চরিত্র কত নির্লোভ ছিলো, কত বিনয়ী, রোমান্টিক অহমিকা থেকে কত সুদূর। নিরন্তর তাঁর ধ্যানের বিষয় তাঁর কবিতাই—কবিতা-রচনায় উপলক্ষের মতো যা কাজ করে, সেই জীবনীগত ঘটনা নয়—তাই আবেগের নিবিড়তম মুহূর্তেও উচ্ছ্বাসের হাতে ধরা দেন না তিনি, কবির উপরে কবিতাকে স্থাপন করেন। 'সুন্দর জাহাজ' কবিতাটি, যাতে একটি তরণী বা তরুণীর গতিভঙ্গি যেন ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তার মনোমুগ্ধকর দোলাচল, মাত্র দশ স্তবকে সীমিত হ'য়ে, এবং বহু একতাল সনেটের পরে এসে, আমাদের মনের মধ্যে এক অপূর্ব আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। যদি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যা কম হ'তো, বা স্তবকের বৈচিত্র্য আরো বেশি, তাহ'লে ঠিক এই অভিঘাতটি ঘটতো না; তাহ'লে হয়তো, দক্ষতায় বিস্মিত হ'য়ে কবিতাকে ভালোবাসতে আমরা ভুলে যেতাম। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কোনো-কোনো লক্ষণ স্পষ্টত আঠারো-শতকী: আবাহন, সম্বোধন, অমূর্তকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা—এগুলি বোদলেয়ার বর্জন করেননি (কবিতার পক্ষে একেবারে বর্জন করা সম্ভবও নয়); তবু লক্ষণীয় যে 'O wild west wind' বা 'হে নূতন, এসো তুমি'-র মতো উচ্চস্বর তাঁর কাব্যে একবারও ধ্বনিত হয় না; তাঁর কণ্ঠস্বর নিরন্তর মৃদু, বাচনভঙ্গি স্বগতোক্তির; তিনি যখন বলেন, 'দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে' তা একটি অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়। 'মতো'-বিদ্বেষী হ'য়ে কবিতায় নূতনত্ব আনতে চাননি তিনি—তাঁর কাব্যে ঐ শব্দের ব্যবহার প্রচুর—উপমাকে অনিবার্য জেনে তিনি উপমাকেই নতুন জন্ম

দিয়েছেন। কী অর্থে নতুন, তার উপলব্ধির জন্য শুধু প্রয়োজন আমাদের পূর্ব-পরিচিত প্রিয় কবিতাগুচ্ছকে মুহূর্তের জন্য স্মরণ করা: শেলির কবিতায় হেমন্ত ঋতু মূর্ত হ'য়ে ওঠে 'প্রেতের মতো পলায়মান, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ রাশি-রাশি ঝরা পাতা'র চিত্রকল্পে; আর বোদলেয়ার, আঁটি-বাঁধা জ্বালানি কাঠ নামাবার শব্দে, শুনতে পান ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, কবরে পেরেক ঠোকার শব্দ, কার প্রস্থানের অলক্ষ্য পদপাত। যাকে রবীন্দ্রনাথ আবাহন করেন 'বন্ধু' ও 'জ্যোতির কনকপদ্ম' ব'লে, সেই সূর্য, বোদলেয়ারের কবিতায়, 'উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্রপারিষদে/আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে।' প্রভেদ শুধু এখানে নয় যে বোদলেয়ারের ভাষা ও ভঙ্গি অনেক বেশি ঘরোয়া, এবং তিনি অনুকম্পায় বিশ্বস্তর; গভীরতর প্রভেদ এই যে রোমান্টিকদের উপমা বর্ণনাধর্মী, আর বোদলেয়ারের উপমা উপমেয়র বিষয়ে যতটা বলে কবির আত্মার বিষয়ে ততোধিক। 'সাবিত্রী' প'ড়ে ধারণা হয়, কোনো-এক কবিকে কাব্যরচনায় প্রেরণা জোগানোই সূর্যের কাজ; কিন্তু বোদলেয়ারের সূর্য খঞ্জকেও 'শিশুর আহ্লাদে' মাতিয়ে তোলে, এবং 'কবির মতো' হীন বস্তুকে মূল্য দেয়, অথচ খড়খড়ির আড়ালে কোনো-এক 'গোপন কাম'কে ব্যাহত করতে পারে না। কবিতাটির বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন ও ভিন্নধর্মী তথ্যের সমাবেশে, এবং তথ্যগুলিকে পরস্পরে প্রবিষ্ট করার ক্ষমতায়; আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে ঐ কবি, রাজা, খঞ্জেরা ও গুপ্ত লম্পট— এদের সকলের মধ্যে বোদলেয়ারই বিরাজমান। চারটি 'বিতৃষ্ণা'য় ও একাধিক 'প্যারিস-চিত্রে' একই প্রক্রিয়া লক্ষ করি আমরা; কবিতার লেখক ও তথ্যের মধ্যে যে-ব্যবধান শেলি অথবা রবীন্দ্রনাথে অনুভাব্য, সেটি সরিয়ে দেবার ফলে বোদলেয়ারের উপমাসমূহে আত্মোদ্ঘাটনের গুণ বর্তেছে, যেন আত্মার কোনো গোপন স্থলে হঠাৎ আলো ফেলা হ'লো; তাঁর উপমাও এক প্রকার স্বীকারোক্তি। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করি 'সুন্দর জাহাজ' কবিতার সেই আশ্চর্য স্তবক:

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কলিমাঘন এক পাঁচনে।

চলার সময়, বসনের আচ্ছাদনে, পদযুগ যে-ভাবে আন্দোলিত হয়, তার ছবিটি অতিকৃত সিনেমার মতো স্পষ্ট, অথচ উপমাটির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে তা কবির এই ধারণা যে যৌন কামনা যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয়, মদির ও মারাত্মক। তেমনি, 'কবরের মতো গভীর' বাসরশয্যা, 'দরগলমান গ্লেসিআরে'র মতো চুম্বনজনিত নিষ্ঠীবন, বা 'কামুক ঝর্নার মতো' কঙ্কালের 'লেস-বোনা গলবন্ধ'। রতি ও ধ্বংসের একতা বোদলেয়ারের মনে নিত্য-জাগ্রত; মার্লো, রেনেসাঁসের সরল সন্তান, এক অমর পংক্তিতে মানবের এক অমর আকৃতিতে বিধৃত করেন, আর বোদলেয়ার, উনিশ শতকের নষ্ট, পরিশীলিত ও সজ্ঞান প্রতিভূ যাতনাকে বর্জন ক'রে কামনাকে ভাবতে পারেন না। তাঁর কবিতায়, যেন 'make me immortal with a kiss'-এর প্রত্যুত্তরে, গরল ও ছুরিকা বলে:

পারিস তার রাজ্য থেকে পলাতে
আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
বাঁচবে পুন তোর পিশাচীর মড়া!

৩

যাকে বৈচিত্র্য বলে, বিস্তার বলে, এমনকি সাধারণত মৌলিকতা বলে, তার কিছুই বোদলেয়ারে নেই। ওঅর্ডস্বার্থের মতো, প্রায় পূর্ণ এক শতক পরে, তিনি নতুন একটি কাব্যরীতির প্রবর্তন করেননি; হুইটম্যানের মতো, কবিতার প্রকরণে ও বিষয়বস্তুতে সঞ্চার করেননি অপূর্বতা; গোতিয়ে বা মালার্মের মতো কোনো গোষ্ঠীর গুরু নন তিনি; পাউণ্ড অথবা এলিয়টের মতো, কোনো 'আন্দোলনে'র নায়কও নন। এই মহত্তম ফরাশি কবিকে বিনয়ীতম কবিও বলা যায়; গোতিয়ে ও ভিক্তর উগোকে ভক্তি ক'রে পরিতৃপ্ত তিনি, সাঁ-ব্যভের তুষ্টিসাধনে অনবরত সচেষ্ট, এবং পূর্বসূরিদের অনুসরণে পরিশ্রমী।

স্বল্প তাঁর কাব্যের উপকরণ ; মিল, উপমা, চিত্রকল্প, এমনকি শব্দের সংখ্যাও পরিমিত। 'নির্বেদ', 'শূন্যতা', 'গহ্বর' ; 'সমুদ্র', 'জাহাজ', 'মাস্তুল' ; 'শব', 'কফিন', 'কবর', 'কঙ্কাল' ; 'তিক্ত', 'মধুর', 'কৃষ্ণ', 'শীতল', 'সুগন্ধি' ; 'ডাইনি', 'পিশাচী', 'ফিন্ডস' ; 'গভীর', 'বিলাসী', 'অন্ধকার', 'উজ্জ্বল', 'রহস্যময়'—এ সব শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ না-করা অসম্ভব। কোনো পংক্তির শেষে 'mer' (সমুদ্র) বা 'amer' (তিক্ত) থাকলে আমরা প্রায় ধ'রে নিতে পারি যে অন্যটি আসন্ন ; 'ténébre' (অন্ধকার) ও 'funébre র (funereal, বাংলায় শোকাবহ বলা যায়) সহবাসেও অভ্যস্ত হ'তে হয় ; té-প্রত্যয়ান্ত যে-কোনো বিশেষ্যপদের কাছাকাছি 'volupté'-র (ইন্দ্রিয়বিলাস) ব্যবহারও, তাঁর রচনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হ'লে, আর আশাতীত থাকে না। আর তাঁর কাব্যের বিষয় হিশেবে যা-কিছু উল্লেখ্য, তার একটি বড়ো অংশ—বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ, কামোন্মাদ ও কামদ্রোহ, ইন্দ্রিয়বিলাস ও 'শয়তানপন্থা', দরিদ্র ও পতিতের জীবন, মৃত্যু ও দূরপ্রয়াণ—এই সবই, উত্তরাধিকারসূত্রে, উগো, গোতিয়ে, স্যাঁ-ব্যুভের কাছে তিনি পেয়েছিলেন, ইংরেজ রোমান্টিকদের কাছে, পেক্রাস বরেল ও তেয়োফীল ও'নেডির মতো ঐকাহিক কবিদের কাছেও। তিনি, চিত্রকর কঁস্তাঁতাঁ গী-র বন্ধু ও ভক্ত, যিনি সব ফ্যাশনকেই 'মনোমুগ্ধকর' বলেছিলেন, দেখেছিলেন প্রসাধন-কলায় 'মানবাত্মার মহিমার একটি লক্ষণ', সাহিত্যিক ফ্যাশনকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন : 'ড্যাণ্ডী', 'ছোটো গোষ্ঠী', 'তরুণ ফ্রান্স'—তাঁর বালকবয়সে উচ্ছ্রিত এই সব প্যারিসীয় চলোর্মির বেগেই তাঁর প্রথম আত্মোপলব্ধি ; মনে হয় এ-সব গোষ্ঠী ও কবিদের পুঁজিপাটা সব তিনি তুলে নিয়েছিলেন—তাঁদের ইংরেজিয়ানা, বিতৃষ্ণাবোধ, মরণোল্লাস, কিছুই বাদ দেয়নি। হয়তো আরো বেশি বলা যায় : সমগ্র রোমান্টিকতাকেই তিনি আত্মসাৎ ক'রে নেন—তার মধ্যে যা দাগি, ময়লা বা রং-চটা, সব সুদ্ধ, সেই বহুব্যবহৃত স্তূপ থেকেই ছেঁকে তোলেন যে-কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত এবং ভবিষ্যতের। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বহুনিন্দিত 'ক্লিশে' সম্বন্ধে

আমাদের ধারণা কিছুটা বদলে যায় ; আমরা দেখতে পাই যে 'ক্লিশে'কে সভয়ে পরিহার ক'রে চলেন ক্ষুদ্র কবিরা, আর প্রতিভাবানেরা তাকে হাত পেতে নিয়ে রূপান্তরিত করেন। রোমান্টিকতার সূত্রগুলিকে কেমন ক'রে তিনি রূপান্তরিত করেন, আর তাঁর নিজস্ব সংযোজনাই বা কতটুকু, প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে তা-ই আমার আলোচ্য হবে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও—অথবা সেইজন্যেই—বোদলেয়ারই পরম রোমান্টিক, তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার—'কামস্কাটকা' নয়—কৈলাস ; রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার মধ্যস্থলে তিনি অনন্যভাবে অবস্থিত। তাঁর রচনায় রোমান্টিক উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা ; তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাঞ্জলতার দৃষ্টান্তস্থল, অথচ ঘন ও গভীর, আকারে ক্ষুদ্র হ'য়েও ইঙ্গিতে দূরপ্রসারী। কোনো দৈব বরপ্রাপ্ত রাজপুত্রের মতো, তিনি যেন সহজেই কবিতাকে সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন : গ্যেটের দার্শনিকতা, হাইনের কৌতুক, গোতিয়ের চাপল্য, উগোর গুরু-মশাইগিরি—এই সব সংকট কাটিয়ে তিনি কবিতাকে ক'রে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভার ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় ও সুপ্রবেশ্য। এবং তাঁর উত্তরসাধকদের মধ্যেও, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই গুণগুলির সমন্বয় আমরা পাই না ; তাঁর তুলনায় ভেরলেন কোমল, র‍্যাঁবো উদ্বেল, এবং মালার্মে নিস্তাপ। কবিতায় সাড়া দিতে পারলেই তাঁর কবিতায় সাড়া দেয়া যায় ; কিন্তু মালার্মে ভাষ্যনির্ভর, এলিয়ট পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী, এমনকি ইএটস অথবা রিলকেরও কোনো-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁদের জীবনী অথবা 'দর্শন' না-জানা পর্যন্ত, চাবি লুকিয়ে রাখে। তর্কাতীত এই কবিদের গৌরব, এবং এও স্বীকার্য যে দুর্বোধ্যতা, বিশেষ এক অর্থে, আধুনিক কবিতার মূল্য বাড়িয়েছে ; কিন্তু যে-দুর্বোধ্যতা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা অতিক্রম্য, তাকে, শেষ পর্যন্ত, কবিতার একটি দুর্বলতা ব'লে আমরা মানতে বাধ্য। তাঁর কবিতার উঁচু মিনারটিকে বোদলেয়ার সোপানহীন ক'রে গড়েননি ; তিনি বর্জন করেননি কাহিনীর সূত্র, চিন্তার পারম্পর্য, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা : আমাদের মনে রাখতে

হবে যে তাঁর কোনো-কোনো গদ্যকবিতাকে প্রায় ছোটোগল্প বলা যায়, এবং তাঁর প্রাবন্ধিক গদ্য প্রসাদগুণে দীপ্যমান। এই গুণটি, আমরা জানি, প্রতিভার অপরিহার্য লক্ষণ নয়, একই লেখকের গদ্যে ও কবিতায় তা সমানভাবে বিরাজ করে না, কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতা—এলিয়ট থেকে কিছুটা ভিন্ন অর্থে—তাঁর গদ্যের মতোই সুলিখিত। অর্থাৎ, তাঁর কাব্যে হেঁয়ালি নেই, নেই অতিসূক্ষ্ম সাহিত্যিক বা আত্মজৈবনিক উল্লেখ; তাতে গভীরতরভাবে প্রবেশ করার জন্য যা প্রয়োজন তা মল্লিনাথগণের মন্তব্য নয়, তারই সঙ্গে দীর্ঘতর, নিবিড়তর সংবাস;—তাঁর প্রতিটি কবিতা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতোদ্ভাসিত। এবং সেইজন্যেই তাঁর আবেদন আজ বিশ্বব্যাপী।

৪

'রোমান্টিকতা বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট ঘটনা'—আমার এই উক্তির সমর্থনে এবার দু-একটি কথা বলতে চাই। ভাবতে অবাক লাগে যে শিল্পকলা, বহু সৃষ্টিশীল শতাব্দী ধ'রে, এমন কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে অস্পৃষ্ট রেখে গেছে, যা মহত্তম অর্থে মানবিক। গ্রীক শিল্পে মৃদুহাস্য নেই; মানব-মুখে সভ্যতার এই আশ্চর্য স্বাক্ষরটি, যাতে বহু বিরোধী ভাব যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হ'য়ে থাকে, তা খৃষ্টপূর্ব দেহপূজকদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়নি। আর যদিও, রীমস ক্যাথিড্রলের 'সহাস্য দেবদূতে'র বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পে মৃদুহাসি উদ্ভাসিত হয়েছিলো, অন্য একটি ভাব, যা মৃদুহাসির সহচর ও পরিপূরক, মানবজীবনের বড়ো একটি তথ্য, হিন্দু, গ্রীক, চৈনিক ও খৃষ্টান শিল্পের পূর্ণোদ্যম সত্ত্বেও, যুগের পর যুগ প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। সেই ভাবটির নাম বিষাদ। বিষাদ, যা য়োরোপীয় রেনেসাঁসের একটি আবিষ্কার, যার প্রথম উদাহরণ পেত্রার্কার কবিতায়, তাকে, মানুষের এক জন্মান্তরক্ষণে, দা ভিঞ্চি হাসির মধ্যে দ্রব ক'রে দিলেন; কোনারকের বাদিনীমূর্তির হাস্য যেমন আনন্দময়, তেমনি মোনা লিসার হাসি বিষাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। এমনকি বত্তিচেল্লির ভেনাসের মুখেও আমরা নির্ভুলভাবে বিষাদের আভাস দেখতে পাই, যার জন্যে মনে হয় যে

প্রতীচীর আনুপূর্বিক শিল্পধারায়, প্রেমের দেবী এই প্রথম একটি আত্মা লাভ করলেন। রেমব্রান্টের সারি-সারি প্রতিকৃতি, সারি-সারি বিষণ্ণ চোখ খুলে রেখে, আমাদের ভুলতে দেয় না মানুষ কত রহস্যময়; আর শেক্সপীয়র, সাহিত্যে রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁর বিশাল অর্কেস্ট্রার মধ্যে একটি মৃদু ও নিঃসঙ্গ বংশীধ্বনি মাঝে-মাঝে শুনতে পাই আমরা—যা ব'লে যায় মানুষের মনে এমন কোনো-কোনো স্তর আছে যা কার্যকারণের অতীত। যে-বিষাদ, বেন জনসনের নাটকে, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার মতো এক ধাতু বা 'humour' মাত্র, যান্ত্রিক ও বিবর্তনহীন এক উপসর্গ, তাকে শেক্সপীয়র দিলেন প্রাণ, গতি ও আধ্যাত্মিক অর্থ, প্রতিষ্ঠা করলেন মনুষ্যত্বের একটি কুললক্ষণ ব'লে। হ্যামলেট, যাকে সাহিত্যে প্রথম আধুনিক মানুষ বলতে লুব্ধ হই আমরা, তার ব্যাপ্ত বিষাদের তবু একটা কারণ বা উপলক্ষ ছিলো; কিন্তু 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অ্যান্টনিও চরিত্র—নাটকের প্রারম্ভেই যে ঘোষণা করে, 'In sooth I know not why I am so sad'—তার বিষয়ে কী ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? শেক্সপীয়রের আশ্চর্য এক সৃষ্টি এই অ্যান্টনিও, হয়তো আরো আশ্চর্য 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা'র এনোবার্বস। যে-ঘটনাচক্রে অ্যান্টনিও প্রথম থেকে লিপ্ত, তাতে তার নিজের লভ্য বা অংশ বলতে কিছু নেই; য়োরোপীয় খৃষ্টান হ'য়েও, সে যেন বিশুদ্ধভাবে গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্ম ক'রে যাচ্ছে; যেমন সে অবিচলভাবে বন্ধুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে উদ্যত হ'লো, সেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মিলনমোদিত পঞ্চমাঙ্কেও তেমনি অনাসক্ত সে; অন্যেরা যেখানে সুখী বা সন্তুষ্ট হয়, শান্তি বা পুরস্কার লাভ করে, সেই রঙ্গমঞ্চে অ্যান্টনিও (নামকরণ অনুসারে যে নাটকের 'নায়ক') যেন অর্ধাচ্ছাদিত এক মূর্তি, তার পা যেন ভূমিস্পর্শ করে না, এক নেপথ্য থেকে আর-এক নেপথ্যে ভেসে যাবার সময়টুকুতে, তাকে বার-বার দেখেও, তার বিষয়ে আমরা কিছুই প্রায় জানতে পারি না: শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝি না তার এই বীর্যনাশক বিষাদের উৎস কোথায়। আর এনোবার্বস যেন উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখি, যে কর্ম করে না শুধু লক্ষ করে, চৈতন্যের প্রতিভূ সে; ঘটনাবহুল নাটকটির মধ্যে

একমাত্র সে-ই কষ্ট পাচ্ছে নিজের অথবা প্রভুর কর্মফলে নয়, বিবেকের দংশনে ; একমাত্র সে-ই নয় দাস অথবা রাজা, বীর অথবা আজ্ঞাবহ ; আর সেইজন্যই, কোনো পূর্বচিহ্নিত স্থান নেই ব'লে, তাকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয় 'কাহিনীর মধ্যে একটি স্থান অর্জনে'র জন্য। আমরা মনে-মনে বুঝি যে এই স্থানটুকু 'অর্জন' করা তার পক্ষে অসম্ভব—কেননা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাপের মধ্যে কোনোটাকেই সে বেছে নিতে পারবে না ; কিন্তু তবু, চতুর্থ অঙ্কের সেই অবিস্মরণীয় ক্ষুদ্র দৃশ্যটিতে—যা মনে হয় শেক্সপীয়র তাঁর কলমের এক আঁচড়ে শেষ ক'রে নায়কনায়িকার গ্রন্থিমোচনের দিকে ছুটেছিলেন, অথচ যার মধ্যে মানবাত্মার এক মর্মবেদনা প্রোথিত হ'য়ে আছে—সেই দৃশ্যে তার প্রবেশমাত্র আমরা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যাই, কেননা তখন, রোমক কূটনৈতিকের ছদ্মবেশ সরিয়ে ফেলে, সে রেনেসাঁসের প্রতিভূ হ'য়ে দেখা দেয় ; সঞ্চার করে, 'O sovereign mistress of true melancholy', চাঁদের উদ্দেশে এই একটি পংক্তি উচ্চারণ ক'রে, আমাদের মনের মধ্যে এমন এক গভীর অনুভূতি, নাটকের ঘটনাসংস্থানে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-ক্ষণে এনোবার্বস কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক না আত্মহত্যা—এই সবই শেক্সপীয়র অস্পষ্ট রেখেছেন ব'লে আমাদের রহস্যবোধ আরো ঘনীভূত হয় ; আমরা যেন অনুভব করি যে এই বিষাদ ও মৃত্যুর অর্থ শুধু এনোবার্বসের আত্মশুদ্ধি নয়, নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রীদের পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত।

শিল্পকলার পূর্ব-ইতিহাসে আমরা কিছুই খুঁজে পাবো না, যা এই সব নিদর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন সাহিত্যে কষ্ট আছে, আর্তি আছে, মনস্তাপ আছে, কিন্তু বিষাদ নেই। ধ'রে নিতে হবে যে বিষাদ ভাবটি মানবচিত্তে আবহমান ; কিন্তু সে-বিষয়ে চেতনার উন্মেষ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে, আর পূর্ণ বিকাশ রোমান্টিকতায়। লা রশফুকো বলেছিলেন যে মানুষ যদি প্রেমের কথা এত না শুনতো তাহ'লে সে প্রেমে পড়তো না। যা সাহিত্যে নেই তা জীবনেও অনুভূত হয় না : রেনেসাঁস-শিল্পে বিষাদের উল্লাস দেখে, তবে মানুষ জানতে পারলো যে বিষণ্ণ হওয়া তার স্বভাবের একটি লক্ষণ। এবং এই জ্ঞানকে

যাঁরা চরমে নিয়ে গেলেন, তার সব সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটন ক'রে দেখালেন যাঁরা, তাঁরাই রোমান্টিকতার প্রবর্তক। রুসো, শাতোব্রিয়াঁ, হেবর্টের, জর্মান 'বিশ্ববিষাদ', বায়রনি জীবনক্লান্তি ; অশ্রু, হতাশা, আত্মহত্যা ;—এই সবের মধ্য দিয়ে অন্তত এই মহাসত্য প্রতিভাত হ'লো যে ভলতেয়ারি 'ক্ষেত্রকর্ষণ'ই মানবজীবনের শেষ কথা নয়। রোমান্টিক অনুভূতি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছলো যেখানে পুলকদেউলের মণিকোঠায় ঘোমটা-পরা বিষাদের দেবী বিরাজ করেন, আর বিষণ্ণতম সংগীতই মধুরতম হ'য়ে ওঠে।

> কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি ?
> হও রূপসী, বিষাদময়ী ! অশ্রুজল
> নতুন রূপে করুক তোমায় শ্রীমতী—('বিষাদগীতিকা')
>
> চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
> প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন ! ('ফোয়ারা')
>
> ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
> শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
> ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন
>
> বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
> কোনো সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী !—
> ম্লান ক'রে দিতে ঠাণ্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি। ('সে-রাতে ছিলাম...')

বার-বার, বোদলেয়ারের কাব্যে, আমাদের পক্ষে এই সুপরিচিত ধারণাটি ধ্বনিত হয়েছে যে কোনো নির্বিষাদ সত্তা, শুধু যে সুন্দর হ'তে পারে না তা নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। 'রূপসী' ও 'বিষাদময়ী' প্রায় সমার্থক, এবং যে-নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন। 'সৌন্দর্য,' একটি 'ফুলিঙ্গে' তিনি লিখেছিলেন, 'আনন্দ তার এক ইতরোচিত ভূষণ, কিন্তু বিষণ্ণতা তার মহীয়সী পত্নী। যার সঙ্গে দুঃখের কোনো সম্বন্ধ নেই এমন কোনো সৌন্দর্য আমার ধারণাতীত।' প্রেমের পূর্ণতাও বিষাদসাপেক্ষ, কেননা, 'কখনো তাদের মিলনসুখ এত মধুর হয়নি, যেমন বিষাদে ও ক্ষমায় ভরা সেই রাত্রে—দুঃখে ও মনস্তাপে পরিপ্লুত সেই সুখ।' এবং এ-সব ধারণায় তিনি তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদের সধর্মী।

কিন্তু বোদলেয়ারের অন্বেষণ আরো দূরস্পর্শী, মানবস্বভাবের আরো গভীরে তিনি নেমেছিলেন। রোমান্টিকদের বিষাদে বিলাসের একটি অংশ আছে; আছে ব'লে নিন্দা করি না তাঁদের, কেননা বিলাস বস্তুটিকে শুধু সুখের আনুষঙ্গিক ব'লে তাঁরাই ভাবতে পারেন যাঁরা আত্মার রহস্য বিষয়ে অজ্ঞান। তবু এ-কথাও স্বীকার্য যে বায়রনি বিষাদ একেবারে নির্ভান নয়, এবং শেলির খেদময় উক্তিসমূহ একটি বালকোচিত সরলতায় আচ্ছন্ন। শেলি, বায়রন, ওঅর্ডস্বার্থ—এঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন অন্য মানুষকে, এবং অন্য মানুষের দুঃখের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজকে; তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে প্রায় যেন এই ভাবটি ধরা পড়ে যে তাঁরাই একমাত্র ভালো এবং অন্য সবাই অসাধু। কিন্তু বোদলেয়ার সেই রোমান্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে তাঁর যন্ত্রণার কারণ তিনি নিজেই, এবং ডস্টয়েভস্কির নায়কনায়িকাদের মতো, দুঃখকে যিনি মানুষের একটি প্রয়োজন ব'লে অনুভব করেন। অর্থাৎ—আর এটাই রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য—যে-মানবস্বভাব রোমান্টিক মতে সহজাতভাবে শুদ্ধ, তাকে বোদলেয়ার দেখেছিলেন দুর্বারভাবে পাপোন্মুখ ব'লে। 'What man has made of man' তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন; তাঁর জিজ্ঞাসা: 'আমি নিজেকে নিয়ে কী করেছি?' ওঅর্ডস্বার্থ, তাঁর নিজের সুবিধেমতো, 'মানুষ' নামক ধারণাটিকে দুই অংশে ভাগ ক'রে নিয়েছেন, এবং নিজের উপর কোনো দায়িত্বই রাখেননি, কিন্তু এই নিশ্চিন্ত আক্ষেপের বদলে আমরা বোদলেয়ারে পাই 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা' বা গদ্যকবিতা 'রাত একটাতে'র মতো রচনায় নিজের প্রতি ক্ষমাহীনতা; পাই, যেন বিশ্বমানবের মর্মপীড়া থেকে উত্থিত এই ক্রন্দনধ্বনি: 'ভগবান, ভগবান, দাও সেই শক্তি ও সাহস, যাতে পারি/দেখে নিতে আমার শরীর মন, বিতৃষ্ণাব্যতীত।' রোমান্টিকেরা আত্মকরুণা করেন, বোদলেয়ার আত্মপরীক্ষা; তাঁরা দোষ দেন অন্যদের, তিনি নিজেকে; তাঁরা চান আদর্শ রাষ্ট্র—যার প্রভাবে সাপ পর্যন্ত নির্বিষ হবে—আর তিনি চান প্রার্থনার দ্বারা আত্মশোধন; তাঁরা—ও পরে প্রকৃতিপন্থীরা—যেখানে পূজা করেছেন ইহুদি সুবিচারের ধারণাকে, সেখানে বোদলেয়ার বেদী গড়েছেন

খৃষ্টীয় করুণার জন্য। তাই তাঁর দরিদ্রবিষয়ক কবিতায় উগো অথবা ওঅর্ডস্বার্থের ভাবালুতা নেই; ঐ কবিদের মতো তিনি ভাবেন না যে দরিদ্র বা গ্রাম্য হ'লেই সাধু হবে, বরং তাঁর 'কেক' নামক গদ্যকবিতায় দারিদ্র্যের পৈশাচিকতার এক ভীষণ ছবি এঁকেছেন তিনি। সত্য, 'গরিবের চোখ' গদ্যকবিতায় ধনীর নিঃসাড়তাও দুঃসহ; কিন্তু 'ধনী' ও 'নির্ধন' শব্দ দুটিকে মানুষের অভিজ্ঞান ব'লে কখনোই তিনি স্বীকার করেননি; তাঁর লাল চুলের ভিখারিনীর চোখেও গূঢ়ুতা প্রকাশ পায়, বস্তিবাসী ন্যাকড়া-কুড়ুনিরাও সুরার প্রভাবে বীরত্ব লাভ করে, এবং ক্ষুধিতেরাও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের স্বপ্ন ত্যাগে। আদিপাপে বিশ্বাসী ব'লে, তিনি কদর্যতা বা মহিমায় ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন; বুঝেছেন যে শুধু তা-ই সর্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি হ'তে পারে যা, সুরা, স্বপ্ন বা ঈশ্বরের মতো, মানুষকে তার দৈহিক অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়।

এবং একই কারণে তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়—শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি; এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ—সেই বিরাট, বহুকথিত, বোদলেয়ারীয় নির্বেদ—যা 'ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।' নির্বেদকে তিনি বলেছেন 'জড়ের সন্তান', যার প্রভাবে 'সময়ের মন্থরতা' অসহ্য হ'য়ে ওঠে, নিজেকে মনে হয় 'নামহীন ত্রাসে পরিবৃত এক শিলাখণ্ড' মাত্র। কিন্তু আসলে—'ফ্যুর দ্যু মাল'-এর ছত্রে-ছত্রে তার প্রমাণ আছে—এই নির্বেদেরও উৎসস্থল চেতনার অবলুপ্তি নয়, চেতনার আতিশয্য। চেতনা যার ক্ষীণ, সে-মানুষ তার নির্বেদকে 'অমরতার সমায়তন' ব'লে অনুভব করে না; আড্ডা, নেশা বা যৌনতায় ম'জে তা থেকে অব্যাহতি পায়। 'পশুর মতো ঘুম', চুম্বনলব্ধ 'বলীয়ান বিস্মরণ', 'সময়ের ভয়ংকর ভার থেকে মুক্তি' তাঁর অনায়ত্ত ব'লেই এ-সবের জন্য বোদলেয়ারের প্রার্থনা এমন অবিরাম। সুরা, অহিফেন ও গঞ্জিকা নিয়ে, আমরা জানি, বহুবিধ পরীক্ষা তিনি করেছেন—প্রায়, তাঁর নিজেরই উপর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা; সে-সবের উদ্দেশ্য চৈতন্যেরই তীক্ষ্ণতা-সাধন; তিনি যেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন এমন এক তুরীয় অবস্থা যাতে সময়

পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হবে না, অনুভূত হবে প্রতিটি মুহূর্তের নিঃসরণ, শ্রুতিগম্য হবে বর্ণ, এবং শব্দ দৃশ্যমান। সফল হয়নি সে-সব পরীক্ষা, হ'তে পারে না—'কৃত্রিম স্বর্গে' তার নিষ্করুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন—কিংবা শুধু সার্থক হয়েছে যন্ত্রণাকে তীব্রতর ক'রে, যে-যন্ত্রণা, অন্য সব অভিজ্ঞান যখন হারিয়ে যায়, চৈতন্যের সর্বশেষ প্রতিভূরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনি, তাঁর পক্ষে যৌনতাও আত্মনির্যাতনেরই একটি উপায়; 'পাপকর্মের চৈতন্য' তার পরম সুখ; যদি তা পাপ হয়—আর বোদলেয়ারের তা-ই বিশ্বাস ছিলো—তাহ'লে তাকে পাপ ব'লে জানতে পারাটাই মনুষ্যত্ব *। 'কঙ্কাল', 'সিথেরায় যাত্রা', 'এক শহীদ', এই সব কবিতায়, নানা ভয়াবহ চিত্রকল্পের সাহায্যে, তিনি তাঁর এই ধারণাটি উপস্থিত করেছেন যে কামনা ও যাতনা অন্যোন্যনির্ভর; কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্মল ও নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি পাই 'আত্ম-প্রতিহিংসা' নামক কবিতাটিতে :

আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিস্ন গাল!
আমি জল্লাদ, আমিই বলি।

রোমান্টিক বিষাদে আশা ছিলো; ছিলো, কৃতী যন্ত্র ও উত্তম আইনের দ্বারা প্রণীত স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনা; কবিরা নিজেদের ভাবতে পারতেন নিষ্পাপ হরিণ ও 'পৃথিবী'কে শ্বাপদ ব'লে। কিন্তু বোদলেয়ার যেহেতু নিজেকে একাধারে বলি ও জল্লাদ ব'লে উপলব্ধি করেছেন, তাই তাঁর দুঃখ অনেক বেশি সত্যবাদী, এবং দুশ্চিকিৎস্য।

* ইতিহাসের একটি কৌতুক এই যে যৌনতান্বেষী বোদলেয়ার তাঁর জীবৎকালে—এবং মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত—সাধারণের মনে চিত্রিত হয়েছেন যৌনতার একটি 'রাক্ষস' রূপে; অনুরাগী পাঠকরাও তাঁকে 'গাণিকালয়ের সন্ত' ব'লে ভুল করেছেন। এও স্মর্তব্য যে পো, কোলরিজ বা ডিকুইন্সির মতো তিনি জীবনের কোনো অধ্যায়েই নেশার দাসত্ব নেননি এবং নেশার প্রভাবে চৈতন্যের কী অবস্থা হয় তার অমন নির্মম বিশ্লেষণ ডিকুইন্সিতেও নেই। ডিকুইন্সির 'কনফেশন্স' প'ড়ে যাঁরা অহিফেনসেবনে লুব্ধ হবেন তাঁদের মোহভঙ্গ হবে 'কৃত্রিম স্বর্গ' পাঠ করলে। বস্তুত, বোদলেয়ারের চরিত্র ছিলো যুগপৎ বিলাসীর ও সন্ন্যাসীর; তাঁর কাব্যের তীব্রতা এই দুয়ের দ্বন্দ্বপ্রসূত।

কিন্তু অচিকিৎস্য নয়। 'প্রগতি'—অর্থাৎ রোমান্টিক সংস্কারস্পৃহার প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁর 'উন্মোচিত হৃদয়ে' লিখেছিলেন—'সত্যকার প্রগতির অর্থ নৈতিক প্রগতি, এবং তা সাধিত হ'তে পারে শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।' 'সত্যকার সভ্যতা,' একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠা পরে আমরা পড়ি, 'আদি-পাপের লক্ষণহ্রাসেরই নামান্তর।' মানুষের পাপবৃত্তি যদি অমর হয়, তাহ'লে পুণ্যের প্রতি তার আকর্ষণও মৌলিক, এবং পাপলিপ্সি অনিবার্য হ'লে, পুণ্যের দিকে অগ্রস্থতিও সম্ভব। 'মাতাল হও', একটি গদ্যকবিতায় তাঁর আজ্ঞা শুনি আমরা, 'সুরা, কবিতা, পুণ্য, যার দ্বারাই হোক, মাতাল হও।' 'ভগবান যদি না-ও থাকেন,' 'ফুলিঙ্গে'র প্রথম উক্তিটি এই, 'তাহ'লেও ধর্ম কম পবিত্র নয়।' আর 'উন্মোচিত হৃদয়ে', শেষ পর্যন্ত, তাঁর সব অবমাননাকে 'ঈশ্বরের করুণা' ব'লে তিনি অঙ্গীকার করেন, লিপিবদ্ধ করেন এই অভিলাষ যে 'দিনে-দিনে নিজের ধরনে, মহাপুরুষ ও সন্ত হ'য়ে উঠতে হবে', কেননা 'তা-ই একমাত্র, যাতে এসে যায়।' কেমন ক'রে, পাপ থেকে স'রে এসে, মানুষ পুণ্যের দিকে পা ফেলতে পারে, তাঁর মনে এই চিন্তা ছিলো নিত্যজাগ্রত। কোনো সংঘবদ্ধ উপায়ে, কোনো সামাজিক 'প্রগতি'র দ্বারা তা সাধিত হ'তে পারে না, তা সম্ভব শুধু 'ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে'। অতএব তাঁর 'বিতৃষ্ণা'র পাশে তাঁর 'আদর্শ'কেও স্থাপন করতে হ'লো—একটি না-থাকলে অন্যটির অর্থ থাকে না—রতিপ্রতিমা 'কৃষ্ণ ভেনাস'-এর মুখোমুখি এক 'শ্বেত ভেনাস'কে, ম্যাডোনা যিনি, সরস্বতী ও দেবদূত, ভোগক্লান্ত 'আধ্যাত্মিক উষা'য় মানসপটে যাঁর মূর্তি 'সূর্যের মতো' প্রতিভাত হয়, এবং যাঁর উদ্দেশে, বহু নরক মন্থন করার পর, ধ্বনিত হয় এই নম্র স্তবগান :

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উষ্ণার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

এখানে আমরা যা পাচ্ছি, তা খোঁয়ারির ক্ষণে লম্পটের অনুতাপ নয়, বহু বিপরীতকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন তেমন এক ভাবুক ব্যক্তির মুমুক্ষা।

'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র 'সংশোধক'রূপে এলিয়ট প্রস্তাব করেছেন 'ভিটা নুওভা' ও 'ডিভাইন কমেডি'; তাঁর কথার আমরা এ-রকম অর্থ করতে পারি যে বোদলেয়ারে নরক-পরিক্রমা থাকলেও স্বর্গ নেই, আর সেখানেই তাঁর কাব্যের ঊনতা। কিন্তু নরক, শোধনাগার ও স্বর্গের বিভেদ দান্তের মনে যেমন গাণিতিকভাবে সত্য ছিলো, আধুনিক মানুষ বোদলেয়ারের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিলো না; বরং তাঁর বিশেষ গৌরব এখানেই যে, শেক্সপীয়র ও ডস্টয়েভস্কির মতো, তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর ব'লে চিনেছিলেন: ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পণ—এই বিরোধী ভাবগুলি, তাঁর ধারণায়, পরস্পরসংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। 'মানবহৃদয় সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে ঈশ্বর ও শয়তানের সংগ্রাম চিরকাল ধ'রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে,' দ্মিত্রি কারামাজভ্-এর এই ঘোষণার পাশেই প্যারিসীয় কবির উচ্চারণ স্মর্তব্য: 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, নিরন্তর, দুই যুগপৎ আসক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে—একটি ঈশ্বরের, অন্যটি শয়তানের প্রতি।' যে-নারীকে 'অমৃতের প্রতিমা' জ্ঞানে বোদলেয়ার নমস্কার জানিয়েছেন তাঁরই উদ্দেশে যখন তিনি বলেন, 'আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছো যন্ত্রণা?' তখন ঐ প্রশ্নের পিছনে অনুক্ত কথাটি আমাদের অজানা থাকে না; তিনি চান 'আনন্দময়ী'ও জানুন কাকে বলে ব্যাধি, দুঃখ ও বিতৃষ্ণা, আর কাকে বলে মৃত্যুভয়, নয় তো তাঁর মানবতা খণ্ডিত থেকে যাবে। এই বৈপরীত্যবোধ, বা বিপরীতের সংযুক্তিবোধের আর-একটি উদাহরণ 'ভ্রমণ' কবিতা—যার রঙ্গমঞ্চ সমগ্র মরজীবন; ঘাতক যেখানে সপ্রেম, উৎসব শোণিতগন্ধী, শক্তিমানেরা অবসাদগ্রস্ত এবং সন্ন্যাসীর 'চটের কণ্টক' কামস্রাবী। স্বর্গে সব বৈপরীত্য অবসিত হয় ব'লে, বোদলেয়ারের কাব্যে স্বর্গের উপস্থিতি নেই; নেই, 'গীতাঞ্জলি'র মতো, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের উন্মাদনা; কিন্তু তার সমগ্র দেহ থেকে, মেঘের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের মতো, তীব্র, প্রোজ্জ্বল ও পৌনঃপুনিক, এই সত্যটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষ্যত্বের পরম অভিজ্ঞান। দান্তের কাব্যে কাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছনো আছে; আর বোদলেয়ারে আমরা পাই অলব্ধের জন্য অসহ্য বেদনাবোধ, যা

আমাদের মনে হয় আরো বেশি মানবিক ও মানবিক মনস্তত্ত্বের অনুগামী। বোদলেয়ারের দুঃখ, সর্বশেষ বিচারে, অমৃতের জন্য বিরহবেদনা ছাড়া আর-কিছু নয়—মানুষের সব দুঃখই মূলত তা-ই—আর সেইজন্যই, গভীরতম আধ্যাত্মিক অর্থে, তাঁর দুঃখ মূল্যবান; শুধু প্রেম বা সৌন্দর্য নয়, তার দ্বারা প্রজ্ঞাও লভ্য। 'হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও'—এই পবিত্র দীর্ঘশ্বাস শেলি অথবা বায়রনে আমরা শুনি না, এবং বোদলেয়ারে শুনি ব'লেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর দুঃখসাধনা কত সার্থক।

৫

রোমান্টিক বিষাদের চরিত্রলক্ষণ এই যে তা অহেতুসম্ভব। কোনো কারণ যদি নির্দেশ করা গেলো তাহ'লেই ছিন্নমূল হবে সেই বিষাদ, যা, বর্ষার আকাশে মেঘের মতো, অলক্ষ্যে, অগোচরে, স্তরে-স্তরে, সমগ্র সত্তায় ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। হেতু যে নেই সেটাই তার অস্তিত্বের হেতু। 'আমার মন ভালো নেই।' 'কেন?' 'জানি না।' 'আমি একজনকে ভালোবাসি।' 'সে কে?' 'কী ক'রে বলি। আমি কি তাকে দেখেছি?'—এই যুক্তিরহিত মনস্তত্ত্ব, আরব, বৈষ্ণব ও ত্রুবাদূর মরমীরা যার আভাস দিয়ে গেছেন, য়োরোপের যুক্তি-যুগের অবসানকালে তা সংহত ও বলীয়ানভাবে প্রকাশ পেলো রুসোর সেই প্রখ্যাত বাক্যাংশে, যার অনুকম্পন পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে অবিরল। 'Je ne sais quoi'—আমি জানি না কী—যা শেক্সপীয়রের অ্যান্টনিওতে ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি—এই কথাটি রোমান্টিকতার মূলমন্ত্র। বাঙালি পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথে 'অকারণ' বিশেষণটি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে—এক-এক সময় প্রায় অকারণেই; মনে করিয়ে দিতে হবে না যে 'কী জানি', 'কে জানে', 'না জানি' প্রভৃতি সমাবেশ তাঁর শব্দরচনার মধ্যে সবচেয়ে ক্লান্তিহীন, যে এই অস্পষ্ট ব্যাকুলতাই তাঁর কাব্যকে সেই আস্বাদ দিয়েছে যাকে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক ব'লে আমরা চিনতে পারি। 'নিশীথে কী কথা ব'লে গেলো/কী জানি, কী জানি'—ঠিক এই রকম সূচিমুখ অস্পষ্টতা

অধিকতর যুক্তিনির্ভর য়োরোপীয় ভাষায় সম্ভব না-হ'লেও, পশ্চিমী রোমান্টিক কাব্যে তুলনীয় মনোভাব আমরা অনেক পেয়েছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে মানুষের মনের প্রক্রিয়ায় সত্যি কিছু অহেতুক হয় কিনা, এবং কবিরা যখন তাঁদের পুলক অথবা বিষণ্ণতাকে 'অকারণ' ব'লে ঘোষণা করেন, সেটাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে, না কি উৎপ্রেক্ষা হিশেবে গ্রহণ করবো।

রোমান্টিক কবিরা দূরপ্রেমিক; বৈষ্ণব কবিদের মতো, কিন্তু কিছুটা ভিন্ন অর্থে, তাঁরা 'ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর' করেছেন—কিংবা কোনোখানেই বাসা বাঁধেননি। পার্নেসিয়ান, সিম্বলিস্ট, প্রি-র‍্যাফেলাইট—নাম যা-ই হোক না—টেনিসন ও ইংরেজ 'চার্টিস্ট'দের বাদ দিয়ে সমগ্র উনিশ শতকের কবিতাই এই লক্ষণধারা আক্রান্ত। যেমন পেত্রার্কার আগে, নিছক কৌতূহলবশত, কেউ কোনো পর্বতে আরোহণ করেনি, তেমনি অন্য কোনো যুগে, নিরন্তর দিগন্তরেখা দেখেও, মানুষ এমন ক'রে দিগন্তকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসেনি পাহাড়ের ওপার বা সমুদ্রের অন্য তীর। 'জীবনকেন্দ্রে গ্রামের বদলে নগর, সমাজে স্থিতির বদলে অস্থৈর্য এলে এমনিই হয়'—এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হ'তে পারি না আমরা, কেননা আথেন্স বা রোমেও নাগরিক জীবন ছিলো, রোমের ছিলো বহু বৈদেশিক সংশ্রব, কিন্তু সাহিত্যে এই দূরতৃষ্ণা ছিলো না। কিংবা, রোমান্টিকদের 'বিরুদ্ধে' যীশুর এই অনুজ্ঞা উপস্থিত ক'রেও লাভ নেই যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে, কেননা নিকটের প্রতি ঈর্ষা যদি মানুষের একটি বৃত্তি হয়, অপরিচিতের প্রতি অবিশ্বাসও তা-ই। রোমান্টিকেরা, সন্দেহ নেই, দূরকে ভালোবেসে মানুষের সংবেদনার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন অসীমের দিকে একটি বাতায়ন। এই দূর, দেশে বা কালে বাস্তব আকার পেয়েছে মাঝে-মাঝে: প্রাচীন গ্রীস, খৃষ্টান মধ্যযুগ, ইটালি, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত—এরা প্রত্যেকে, কোনো-না-কোনো সময়ে, ধারণ করেছে সেই রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাকে, আসলে যার কোনো আধার নেই। আধার নেই—কেননা ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে, বা কোনো ভৌগোলিক মণ্ডলে, হৃদয়ের 'আদর্শ'কে খুঁজে পাওয়া যায় না, কল্পলোক কল্পনাতেই থেকে যায়; শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতিবেগ, শুধু

সন্ধান, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ওভিদের বিখ্যাত উক্তি, 'অজানাকে কেউ ভালোবাসতে পারে না'*—এই ক্লাসিক সূত্রের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ ক'রে রোমান্টিকেরা তারই জয়ধ্বনি তুললেন যা অজানা ও অসীম, অনির্ণেয় ও অপ্রাপণীয়। যা সীমিত, তাকে শাতোব্রিয়াঁর নায়ক কোনো মূল্য দেয় না, এক 'অজানা' তাকে নিরন্তর তাড়না করে। 'আমি বাসনায় দগ্ধ হচ্ছিলাম,' রুসো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কিন্তু বাসনার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিলো না।' এই মনোভাবের চরম পরিণতি কোনখানে তাও রুসোরই একটি সুখের কথায় ধরা পড়েছে: 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়।'

শুধু যদি আমরা চিন্তা করি যে রোমান্টিক কাব্যে বায়ু অথবা ঝটিকা কত বার এবং কত বিচিত্রভাবে স্থান পেয়েছে, তাহ'লেই আমাদের সন্দেহ থাকে না যে গতিসাধনা রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। ওঅর্ডস্বার্থের 'ইমর্টেলিটি', কোলরিজের 'ডিজেকশন', শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড' ও রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'—এই চারটি প্রতিভূস্বরূপ কবিতা, বাতাসকে অবলম্বন ক'রেই, তাদের আবেগের চাপ সহ্য করতে পেরেছে। অন্যান্য প্রিয় চিত্রকল্পের মধ্যে নৌকো বা জাহাজ উল্লেখ্য, আর স্রোত, নির্ঝর বা নদী। তিনটি যাত্রার কবিতা অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত আছে আমাদের মনে: বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ', র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী', ও রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা।' নানা রূপে ভ্রমণে আমরা অভিজ্ঞ হয়েছি: স্কটে ঐতিহাসিক, বায়রনে ও শাতোব্রিয়াঁতে ভৌগোলিক, কোলরিজে আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত, বোদলেয়ারে ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক। আর রবীন্দ্রনাথের

* ওভিদের 'বিষাদ' কাব্যে যে-কষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, বা 'মেঘদূতে'র যক্ষের মুখে যে-অশ্রুজল বিলাপ আমরা শুনতে পাই, তার বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে রোমে অথবা অলকায় প্রত্যাবর্তনমাত্র তার চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু রোমান্টিক কবি নিজেকে অনুভব করেন আদিস্বর্গ থেকে নির্বাসিত ব'লে—শুধুমাত্র কোনো রাজধানী বা ভুজবন্ধ থেকে নয়। তাই, নিজে লাতিন সংস্কৃতির প্রেমিক ও উত্তরাধিকারী হ'লেও, বোদলেয়ার বলতে পারেন:

'বঞ্চিত হ'য়ে লাতিন স্বর্গ থেকে
ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না।' ('অনুকম্পায়ী রাস')

ক্রন্দনের এত গভীরতর কারণ আছে যে 'লাতিন স্বর্গ' সে-তুলনায় তুচ্ছ; তাঁর 'দূরদৃষ্টি' মৌলিক।

সব কবিতাকে একত্র ক'রে নিয়ে 'ভ্রমণ' নাম দিলে ভুল হয় না; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে 'পূরবী'র 'ঝড়' পর্যন্ত এক অবিরাম আন্দোলনে আমরা প্রহৃত হচ্ছি; ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে; ঔপনিষদিক ভারত, কালিদাসের কাল, মোগল-পাঠানের ভারত, বহুলক্ষণযুক্ত ভৌগোলিক পৃথিবী—এক-একটি স্তম্ভ রচনা ক'রে দিয়ে একে-একে এরা স'রে যাচ্ছে; আর যা স্থায়ী, যা অনবরত ও অপ্রতিহত, যা তাঁর উদ্‌ভ্রান্তিজনক বৈচিত্র্যের মধ্যে ভক্ত পাঠকের আশ্রয়স্বরূপ, তারই নাম তিনি যৌবনে দিয়েছিলেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। লক্ষণীয়, ঐ কবিতার যাত্রা শুধু নিরুদ্দেশ নয়, রহস্যময় কাণ্ডারীটি বিদেশিনী। এবং সেই নারীও 'বিদেশিনী', যাকে—আসলে চেনেন না ব'লেই—কবি চেনেন ব'লে আপন মনে অনুমান করেন, 'শারদপ্রাতে বা মাধবীরাতে' মাঝে-মাঝে যাকে দেখা যায়, আর যার কাছে, শেষ পর্যন্ত, অতিথির অধিক মর্যাদা মেলে না। 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে/ এসেছি নূতন দেশে/আমি অতিথি তোমারি দ্বারে/ওগো বিদেশিনী'—এই পংক্তিগুলিতে একাধিক ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত; 'ভুবনভ্রমণ' শেষ ক'রে যদি 'নূতন' দেশে আসা যায়, তার মানে সেই 'দেশ' পৃথিবীর বাইরে, এবং যা পৃথিবীর বাইরে তার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই। 'আমি অতিথি তোমারি দ্বারে—' অতিথি, অর্থাৎ অস্থায়ী আগন্তুক; এবং সে 'দ্বারে' মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থনা করছে প্রবেশের অধিকার, সে-প্রার্থনা পূরণ ক'রে দ্বার মুক্ত হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। এবং, বলা বাহুল্য, 'বিদেশিনী' শব্দটিতেই এক গভীর, গম্ভীর অপরিচয়ের দ্যোতনা আছে; গন্তব্য যেমন অজানা, প্রেমাস্পদাও তেমনি অনির্ণেয়। আমরা অবাক হই না, যখন স্থিতিশীল হিন্দু সমাজকে বিদীর্ণ ক'রে এই কবি বাঁশির মতো ব'লে ওঠেন: 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'; বা, আরো কিছুকাল পরে, ঘোষণা করেন 'ঝঞ্ঝারসমদমত্ত বলাকা'র উৎকাঙ্ক্ষা: 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত ও ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড-এ মুদ্রিত।
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক: বুদ্ধদেব বসু

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪